POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَلَوْ تَرٰۤى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا
يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا
وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ۝٢٨ (الانعام:28)

এবং তুমি যদি দেখিতে পাইতে, যখন তাহাদিগকে আগুনের সম্মুখে দণ্ডায়মান করা হইবে, তখন তারা বলিবে, হায়! যদি আমাদিগকে ফেরৎ পাঠানো হইত, তাহা হইলে আমরা আমাদের প্রভুর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিতাম না, এবং আমরা মো'মেনদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম। (আন-আনআম:২৮)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 7

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 8

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 24 ফেব্রুয়ারী, 2022 22 রজব 1443 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

মদীনার শ্রেষ্ঠত্ব

১৪৮০) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা.)-র পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সা.)বলেছেন: আমাকে এমন জনপদে (যাওয়া)-র আদেশ দেওয়া হয়েছে যা অন্যান্য জনপদকে খেয়ে ফেলবে। এটিকে 'ইয়াসরাব' বলা হয় আর সেটি হল মদীনা যা (অসৎ) মানুষদের (জঞ্জালের ন্যায়) বের করে দিবে যেভাবে লোহার ভাটা লোহার ময়লা বের করে দেয়।

নোট: হযরত সৈয়্যদ জয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ সাহেব এর ব্যাখ্যায় বলেন: মদিনার যথাযথ পবিত্রতা একমাত্র তখনই বজায় থাকতে পারত যদি দুর্বৃত্ত শ্রেণীর লোকেরা সেখানে না থাকত। পরের ঘটনাক্রম আঁ হযরত (সা.)-এর কথাটির অক্ষরে অক্ষরে সত্যায়ন করেছে। ইহুদী গোত্রগুলি চুক্তিভঙ্গ করেছিলে এবং বাইরের শত্রুদের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্র করে মদীনার উপর আক্রমণ করিয়েছিল। অবশেষে নিজেদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে একে একে তাদেরকে মদীনা থেকে বের করে দেওয়া হয়। আঁ হযরত (সা.)-এর কথার দ্বিতীয় অংশটিও সেই সময় পূর্ণ হয় যখন মদীনা ইসলামী বিশ্বের কেন্দ্রভূমি হয়ে ওঠে এবং খলীফায়ে রাশেদীন-এর যুগে বিরাট বিরাট জয় অর্জিত হয়েছে। অন্যান্য জনপদকে খেয়ে নেওয়ার অর্থ সেগুলি বিজিত হবে।

(সহী বুখারী, ৩য় খণ্ড, কিতাবু ফাযায়েলুল মাদীনা, ২০০৮)

এযুগে ইসলামকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত নৈরাজ্য বিরাজ করছে সেগুলি দূর করতে অংশ নেওয়া একজন মুসলমানের জন্য আবশ্যক।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

ভবিতব্য

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: বিরুদ্ধবাদীদের মধ্য থেকে অনেকে এমন আছে যাদের আমাদের জামাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া নিশ্চিত। তারা বিরোধিতা করে আর ফিরিশতারা তাদেরকে দেখে হাসে, এই জন্য যে অবশেষে তারা এদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। তারা আমাদের গোপন জামাত যা একদিন আমাদের সঙ্গে মিলিত হবে।

এ যুগের প্রধান ইবাদত

"এযুগে ইসলামকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত নৈরাজ্য বিরাজ করছে সেগুলি দূর করতে অংশ নেওয়া একজন মুসলমানের জন্য আবশ্যক। সেই নৈরাজ্য দূর করতে প্রত্যেকের অংশগ্রহণ করাই হল প্রধান ইবাদত। বর্তমান কালে যে দুরাচার ও কদাচার বিরাজ করছে, সেগুলিকে নিজের বক্তব্য, জ্ঞান এবং খোদা প্রদত্ত যাবতীয় শক্তিসহকারে নিষ্ঠাপূর্ণ প্রচেষ্টা দ্বারা নির্মূল করা প্রত্যেকের কর্তব্য। কেউ যদি ইহজগতেই সুখ ও আনন্দ লাভ করে নেয় তবে লাভ কি? পৃথিবীতেই যদি প্রতিদান পেয়ে যায় তাহলে কি আর লা করলে! পরকালের প্রতিদান লাভ কর যা অসীম। প্রত্যেকের মধ্যে খোদার একত্ববাদের জন্য এমন উন্মাদনা থাকা চাই যেমনটি স্বয়ং খোদা স্বীয় একত্বের জন্য আবেগ রাখেন। ভেবে দেখ! পৃথিবীতে আঁ হযরত (সা.)এর ন্যায় নিপীড়িত ব্যক্তি কোথায় খুঁজে পাবে? এমন কোনও আবর্জনা নেই যা তাঁর দিকে নিক্ষেপ করা হয় নি, এমন কোন কুবচন নেই যা তাঁর উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয় নি। এটি কি মুসলমানদের জন্য চুপ করে বসে থাকার সময়? যদি এই মুহূর্তে কেউ উঠে না দাঁড়ায় এবং সত্য সাক্ষী দিয়ে মিথ্যাবাদীর মুখ বন্ধ না করে দেয় এবং আমাদের নবীর উপর নির্লজ্জভাবে অপবাদ দেওয়াকে এবং মানুষকে পথভ্রষ্ট করাকে বৈধ বলে ধরে নেয়, তবে স্মরণ রেখো যে এমন মুসলমানকে গুরুতর জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে। যা কিছু জ্ঞান তোমরা অর্জন করেছ তা এই পথে ব্যয় করে মানুষকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করা উচিত। হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, দাজ্জালকে তোমরা হত্যা না করলেও সে এমনিই মারা যাবে। একটি বিখ্যাত প্রবাদ রয়েছে- 'হার কামালে রায ওয়ালে'- অর্থাৎ প্রত্যেক শিখরের পতন অবশ্যম্ভাবী। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে এই বিপদাপদের শুরু আর এখন তা শেষ হওয়ার সময় আসন্ন। প্রত্যেকের কর্তব্য, যতদূর সম্ভব মানুষকে আলো দেখানোর চেষ্টা করা ।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৫৬-৩৫৭)

যদি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড একটি শৃঙ্খলে সন্নিবিষ্ট থাকে, তবে এর স্রষ্টা হিসেবে একজন খোদাকেই স্বীকার করতে হবে।

اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ
بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)সূরা নহলের ২৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

এখানে যে বলা হয়েছে যে, তোমাদের খোদা এক ও অভিন্ন-এটি কেবল দাবিসর্বস্ব নয়।কুরআন করীম যখন অস্বীকাকারীদেরকে সম্বোধন করে, তখন শুধু দাবি উপস্থাপন করে না, কেননা শুধু দাবি তাদের উপর কোনও প্রভাব ফেলতে পারে না। বরং এমন ক্ষেত্রে সে দুটির মধ্যে একটি পন্থা অবলম্বন করে। হয় দাবি করার পর যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করে, অথবা যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করার পর এই উপসংহার করে। এই দুই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই মানুষের মন আশ্বস্ত হয়। এবং কার্যত এই উভয় পন্থাই অত্যন্ত উপযোগী। অনেক সময় দাবি করার পর যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করা কার্যকরী হয় আর অনেক সময় ঘটনা বর্ণনা করার পর যুক্তি দেওয়া বেশি উপযোগী হয়। এখানে দ্বিতীয় পন্থাটি অবলম্বন করা হয়েছে এবং প্রথম আয়াতের যৌক্তিক উপসংহার পেশ করা হয়েছে।

প্রথম আয়াতে দুটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। প্রথমত, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড একসূত্রে গ্রোথিত রয়েছে এবং একটি বস্তু অপর বস্তুর উপর নির্ভরশীল। মানুষের সৃষ্টি হল মূল বিষয়। তার প্রথম খাদ্য হল প্রাণীজ। প্রাণী গাছপালা ভক্ষণ করে। প্রাণীজগত গাছপালা থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। আর গাছপালা তথা উদ্ভিদজগত বৃষ্টির জল দ্বারা পুষ্টি লাভ করে আর সেই জল মানুষেরও পানের কাজে আসে। সেই জল থেকে শস্যদানা উৎপন্ন হয় যা মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এগুলি সবই দিবারাত্রি সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে বৃদ্ধি লাভ করে। অপরদিকে এগুলি প্রতিষ্ঠিত থাকার মাধ্যম হল সমুদ্র যার জলরাশি থেকে মানুষ জল লাভ করে আর সমুদ্রকে পুষ্ট রাখতে পাহাড় রয়েছে যেখানে জল সঞ্চিত থাকে। সেখান থেকে

এরপর ৮ পাতায়.....

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২১ জানুয়ারী, ২০২২
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত নিউজিল্যাণ্ড, ২০১৩ (সেপ্টেম্বর),
প্রশ্নোত্তর (পত্রাদি, বৈঠক প্রভৃতির সংকলন)
হুযুরের সঙ্গে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের বিবরণ

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

বি:দ্র:- সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

প্রশ্ন: রোযারত অবস্থায় যদি ঋতুস্রাব শুরু হয়ে যায়, তবে রোযা পুরো করা উচিত না কি ভেঙ্গে ফেলা উচিত? ঋতুস্রাব যখন বন্ধ হয়, তখন সেহরির পর পবিত্র হওয়া যায় কি, না কি সেহরীর পূবেই পবিত্রতা অর্জন করা আবশ্যক?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: মেয়েদের এই প্রকৃতিগত অবস্থাকে কুরআন করীম 'আযান' অর্থাৎ যন্ত্রণার অবস্থা আখ্যায়িত করেছে। এই অবস্থায় ইসলাম মেয়েদের যাবতীয় ইবাদত থেকে অব্যহতি দান করেছে। তাই যে সময় ঋতুস্রাব আরম্ভ হয়, তখনই রোযা ভেঙ্গে যায় আর ঋতুস্রাব বন্ধ হলে এবং পূর্ণত পবিত্রতা অর্জনের পরেই রোযা রাখা যেতে পারে। আর যে রোযাগুলো (শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত) বাদ পড়ে যায়, রমযানের পর যে কোন সময় সেগুলি পূর্ণ করা যেতে পারে।

প্রশ্ন: হযরত সাওবান (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ,'রসুল করীম (সা.) বলেছেন, তোমাদের এক ধনভাণ্ডারের কারণে তিন ব্যক্তি যুদ্ধ করবে (এবং নিহত হবে) তিন খলীফার (প্রশাসকের) পুত্ররা থাকবেন, কিন্তু সেই ধনভাণ্ডার তাদের মধ্য থেকে কেউই পাবে না। অতঃপর পূর্বের দিকে শুভ্র ধ্বজা উদিত হবে। তারা তোমাদেরকে এমন হত্যা করবে যা হবে অভূতপূর্ব ঘটনা। এরপর তিনি আরও কিছু কথা বলেছিলেন যা আমার স্মরণ নেই। অতঃপর তিনি বলেন, যখন তোমরা তাঁকে (মাহদীকে) দেখবে, তোমরা তখন তাঁর বয়আত করো, বরফের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হলেও। কেননা তিনি আল্লাহ্‌র খলীফা মাহদী।' উক্ত হাদীসের একাংশের ব্যাখ্যা করার পর ভদ্রলোক এ সম্পর্কে হুযুরের মতামত জানতে চেয়েছেন এবং হাদীসের বিশদ ব্যাখ্যা চেয়েছেন।

হুযুর আনোয়ার ২০২০ সালের ৩০ শে মে এই প্রশ্নের উত্তরে লেখেন-

আপনি হাদীসটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন 'আল জারায়েয যুখখার' থেকে। অপরদিকে এটি সিহাহ সিত্তা-র সুনান ইবনে মাজার কিতাবুল ফিতন-খুরুজুল মাহদী অধ্যায়েও বর্ণিত হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত ধনভাণ্ডার এবং খলীফা পুত্রদের সম্পর্কে আপনার ব্যাখ্যাটি রূপক অর্থে।

আমার মতে এই হাদীসে আঁ হযরত (সা.) এমন সব ঘটনাবলীর সংবাদ দিয়েছেন যেগুলি উম্মতে মুসলেমায় ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে। যেগুলির মধ্যে কিছু ঘটনা জাগতিক বিষয়াদির সঙ্গে সম্পর্ক রাখে এবং কিছু ঘটনা আধ্যাত্মিক বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। যদিও কিছু কিছু উলেমাদের নিকট ধনভাণ্ডার বলতে খানা কাবাকে বোঝানো হয়েছে, কিন্তু সেই ধনভান্ডার তো বহু প্রশাসকের হস্তগত হয়েওছে।তাই খানা কাবা হাদীসে উল্লেখিত সেই ধনভাণ্ডার হতে পারে না। কেননা হাদীসে হুযুর (সা.) বলেছেন, সেই ধনভাণ্ডার তাদের মধ্য থেকে কেউই পাবে না। অতএব , এর দ্বারা সেই আধ্যাত্মিক ধনভাণ্ডারকে বোঝানো হয়েছে যা আঁ হযরত(সা.) তাঁর মৃত্যুর পর নবুয়্যতের পদ্ধতিতে খিলাফতের ধারা সূচিত হওয়ার মাধ্যমে লাভ করার সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন। আর যেহেতু কুরআন করীম এই ধনভাণ্ডার লাভের জন্য ঈমান ও সৎকর্মকে প্রাথমিক শর্ত হিসেবে ধার্য করেছে যা জাগতিক এই শাসকদের মধ্যে অনুপস্থিত ছিল, সে কারণে তারা সেই সম্পদ লাভের জন্য অনেক যুদ্ধ করেছে কিন্তু সেই আধ্যাত্মিক সম্পদ কারোর করায়ত্ত হয় নি।

এই কারণে এই হাদীসে আঁ হযরত (সা.) ধনভাণ্ডারের জন্য যুদ্ধকারীদের জন্য কেবল 'ইবনে খলীফা' শব্দ-বন্ধন ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ তারা আক্ষরিক অর্থে খলীফা বা উত্তরাধিকারী হবে ঠিকই, কিন্তু তারা আল্লাহ্ তা'লা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত খলীফা বা নবুয়তের ভিত্তিতে পাওয়া খিলাফতের অনুসারী খলীফা হবে না। অপরদিকে এই হাদীসেই হুযুর (সা.) সেই ব্যক্তির জন্য 'খলীফাতুল্লাহ্ আল মাহদী' শব্দ-বন্ধন ব্যবহার করেছেন যার সম্পর্কে তিনি 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়্যত ' বা নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত লাভ করার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

এই হাদীসে মুসলমানদের নিধনের যে বর্ণনা রয়েছে, সে সম্পর্কে আপনি নিজের এই মতামত ব্যক্ত করেছেন যে সেটি মাহদীর মাধ্যমে হবে। আমার মতে আপনার এই ধারণাটি সঠিক নয়। এর অর্থ যদি আক্ষরিক অর্থেই হত্যা ও খুনোখুনি বলে ধরা হয়, তবে তা মোটেই মাহদীর দ্বারা সংঘটিত হতে পারে না। বরং হুযুর (সা.)-এর আরেকটি হাদীসে (মিশকাতুল মাসাবিহ) বর্ণিত 'উৎপীড়নের রাজত্ব' এবং 'জবরদস্তিমূলক রাজত্ব' শব্দ-বন্ধনে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে সেই দুটি যুগে মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধের খুনোখুনি, হত্যালীলা এবং রক্তপাতকে বোঝানো হয়েছে। এছাড়াও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোঙ্গল জাতির হাতে মুসলমানদের নরসংহারকে বোঝানো হয়েছে।

খলীফাতুল্লাহর্ দ্বারা এই হত্যালীলা যে সংঘটিত হবে না তার এটিও একটি প্রমাণ যে, হুযুর (সা.) বর্ণনা করেছেন, আগমণকারী মাহদীর একটি বৈশিষ্ট্য হবে তিনি যুদ্ধবিগ্রহ ও খুনোখুনির অবসান ঘটাবেন। (সহী বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া, বাব নুযুলে ঈসা)। তাই এটা কিভাবে সম্ভব যে, একদিকে হুযুর (সা.) আগমণকারী মাহদীকে শান্তি ও সৌহার্দ্যের ধ্বজাবাহক হিসেবে আখ্যায়িত করছেন আর অপরদিকে তাঁরই মাধ্যমে উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার সদস্যদের এমন এমন অভূতপূর্ব হত্যালীলার সংবাদ দিচ্ছেন ?

এছাড়া এই হাদীসে বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন যে, 'এরপর মহানবী (সা.) আরও কিছু কথাও বলেছিলেন যা আমার মনে নেই।' এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য। খুব সম্ভব যে সেই কথাগুলি ছিল দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ সম্পর্কে। কেননা হাদীসগ্রন্থসমূহে একাধিক বর্ণনা রয়েছে, যেখানে আঁ হযরত (সা.) দাজ্জালের ফিতনাকে সব থেকে বড় ফিতনা রূপে চিহ্নিত করেছেন এবং এর মোকাবেলা স্বীয় উম্মতকে মসীহ মওউদ এর সুসংবাদ প্রদান করেছেন। বর্ণনাকারীর কথা অনুসারে এই কথাগুলি বলার পর হুযুর (সা.) হযরত ইমাম মাহদী (আ.)এর আগমণের উল্লেখ করেছেন। এবং তাঁর বয়আত করাকে অনিবার্য হিসেবে আখ্যায়িত করে নির্দেশ দিয়েছেন যে, বরফের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হলেও অবশ্যই তার বয়আত করো। কেননা তিনি আল্লাহ্‌র খলীফা মাহদী।

অতএব, হুযুর (সা.) এই হাদীসে তিনটি ভিন্ন যুগের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় অনুযায়ী আঁ হযরত (সা.) এবং কল্যাণময় খিলাফতে রাশেদার যুগের অবসানের পর মুসলমানেরা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ শুরু করবে, নিজেদের লোকদের রক্তপাত ঘটাবে। সেই সময় তারা আধ্যাত্মিক ধন-ভাণ্ডার থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বে। দ্বিতীয় যুগটি সেই যুগ, যখন মুসলমানেরা জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও দূর্বল হয়ে পড়ার কারণে অমুসলিমেরা তাদের রক্ত নিয়ে খেলবে এবং তৃতীয় যুগটি হল সেই যুগ যখন আঁ হযরত (সা.)এর সুসংবাদ অনুযায়ী ইমাম মাহদী ও মসীহ মহম্মদী-র আবির্ভাব ঘটবে এবং উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার যে অংশটি হুযুর (সা.)-এর এই একনিষ্ঠ দাস এবং আধ্যাত্মিক পুত্রের বয়আত করে তাঁর বাহুপাশে আবদ্ধ হবে, তাদের জন্য পুনরায় সেই সতেজতার দিন ফিরে আসবে যেমনটি তারা আঁ হযরত (সা.)এর কল্যাণমণ্ডিত যুগে দেখেছিল।

হাদীসে উল্লেখিত হত্যা ও খুনোখুনির কথা যদি রূপক অর্থে ধরা হয়, তবে এর অর্থ হবে, যেভাবে সহী বুখারীতে 'ইয়াজাউল হারব'-এর হাদীসে উল্লেখিত 'ফা ইয়াকসিরুস সালীবা ওয়া ইয়াকতুলুল খানযিরা-এর প্রকৃত অর্থ আক্ষরিক অর্থেই ক্রুশ ভঙ্গ করা এবং শূকর বধ করা নয়। বরং এর দ্বারা খৃষ্টধর্মের পক্ষ থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে হওয়া আপত্তিসমূহের মোক্ষম উত্তর দেওয়াকে বোঝানো হয়েছে। অনুরূপভাবে ইমাম মাহদীর মাধ্যমে মুসলমানদের নিধন বলতে বোঝানো হয়েছে যে, তাদের মধ্যে প্রচলিত ভ্রান্ত ধর্মবিশ্বাসকে সমূলে উৎপাটন করা হবে এবং ধর্মের সংস্কার করে সেটিকে আঁ হযরত (সা.) এর শিক্ষা সম্মত করে পৃথিবীতে প্রচলন দেওয়া হবে।

আমার মতে হাদীসটির অর্থ এভাবে করলে বেশি ভাল ব্যাখ্যা করা যায় এবং 'কতল' (হত্যা) শব্দেরও অর্থ স্পষ্ট হয়।

প্রশ্ন: এক আরববাসী হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে লেখেন যে, জামাত আহমদীয়া কি আবাযিয়া ফির্কার হাদীস 'মুসনাদ আর রবী বিন হাবীব'-গ্রন্থটিকে সঠিক বলে মনে করে এবং তা মেনে চলে?

হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০২০ সালের ৩০ শে মে তারিখের চিঠিতে লেখেন- হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী হাদীস সম্পর্কে জামাত আহমদীয়ার ধর্ম বিশ্বাস হল, কুরআন ও সুন্নতের পর হিদায়াতের (পথনির্দেশনা) তৃতীয় মাধ্যম হল হাদীস এবং তা কুরআন ও সুন্নতের সেবকের মর্যাদা রাখে।কিন্তু যে হাদীস কুরআন এবং সুন্নতের পরিপন্থী এবং এমন কিছু হাদীসের পরিপন্থী যেগুলি কুরআন সম্মত বা সহী বুখারীর পরিপন্থী, সেই হাদীসগুলি গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা সেগুলি গ্রহণ করতে হলে কুরআন করীম এবং কুরআন সম্মত সমস্ত হাদীসকে বাতিল করতে হয়। হুযুর (আ.) বলেছেন, যদি কোন হাদীস কুরআন ও সুন্নতের পরিপন্থী না হয়, তবে সেই হাদীস মেনে চলা এবং মানুষের তৈরী ফিকাহর উপর তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া আমাদের কর্তব্য হবে তা সে যতই তুচ্ছ হোক। অতি দুর্বল হাদীসকেও আমরা পালনযোগ্য মনে করি, যদি না তা কুরআন শরীফের পরিপন্থী হয়। হুযুর (আ.) বলেন, 'যদি কোন হাদীসে কুরআন করীমের স্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণের পরিপন্থী হয়, সেটি বুখারীর হাদীস হোক বা মুসলিমের, আমি

এরপর ৯ পাতায়.....

জুমআর খুতবা

অস্ত্র তুলে নেওয়ার পর ঐশী সিদ্ধান্তের পূর্বেই তা নামিয়ে রাখা আল্লাহ্ নবীর মর্যাদা পরিপন্থী। অতএব, এখন খোদার নাম নিয়ে অগ্রসর হও। তোমরা যদি ধৈর্য প্রদর্শন কর, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য তোমাদের সঙ্গে থাকবে। (হাদীস)

মদীনা পৌঁছনোর আঁ হযরত (সা.) সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণের প্রতি মনোনিবেশ করেন।

ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, আঁ হযরত (সা.) সাহাবাদের মাঝে দু'বার ভ্রাতৃত্ববন্ধন রচনা করেছিলেন। একবার হিজরতে পূর্বে মক্কায় এবং দ্বিতীয়বার মদীনায়।

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান সাহাবী দ্বিতীয় খলীফায়ে রাশেদ সিদ্দীকে আকবার হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

বদরের যুদ্ধে রওনা হওয়ার সময় সাহাবাদের কাছে সত্তরটি উট ছিল। এজন্য একটি উটে তিনজন করে আরোহন করার জন্য নির্ধারণ করা হয় যাতে পালাক্রমে প্রত্যেকে আরোহন করত। হযরত আবু বাকার, হযরত উমর এবং হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.) একটি উটে পালাক্রমে আরোহন করেছিলেন।

হযরত আবু বকর (রা.) তাঁবুতে নগ্ন তরবারি হাতে নিয়ে তাঁর নিরাপত্তার জন্য তাঁর (সা.) কাছে দাঁড়িয়ে থাকেন। আর মহানবী (সা.) সারারাত আল্লাহ্র দরবারে বিগলিত চিত্তে দোয়া করেন। উল্লেখ আছে যে, পুরো সৈন্যবাহীনির মাঝে একমাত্র তিনিই রাতভর জাগ্রত ছিলেন বাকী সবাই পালা করে ঘুমিয়ে নিয়েছেন।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত** ২১শে জানুয়ারী, ২০২২, **এর জুমুআর খুতবা (২১ সুলাহ, ১৪০১ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: বর্তমানে হযরত আবু বকর (রা.)'র স্মৃতিচারণ হচ্ছে। মদীনায় পৌঁছার পর মহানবী (সা.) সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণের প্রতি মনোনিবেশ করেন। এ সম্পর্কে সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন যে মদীনা জীবনের সর্বপ্রথম কাজ ছিল মসজিদে নববীর নির্মাণ। যে জায়গায় তাঁর (সা.) উটনী গিয়ে বসে পড়েছিল সেই জায়গাটি মদীনার দুই মুসলমান বালক, সাহল ও সোহেলের মালিকানাধীন ছিল। এরা দু'জন হযরত আসাদ বিন যুরারার তত্ত্বাবধানে ছিল। এটি একটি পরিত্যক্ত জমি ছিল যার একাংশে বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন খেজুর গাছ ছিল এবং অপরাংশে কিছু ধ্বংসাবশেষ ছিল। মহানবী (সা.) এ জায়গাটিকে মসজিদ এবং তাঁর বিভিন্ন কক্ষ নির্মাণের জন্য পছন্দ করেন। তিনি উক্ত জমির মূল্য দশ দিনার নির্ধারণ করেন। সে যুগে তিনি (সা.) ও অন্যরা জমির এ মূল্যই নির্ধারণ করেন। যাহোক, দশ দিনারের বিনিময়ে উক্ত জমি ক্রয় করা হয় এবং জমি সমান করে, গাছপালা কেটে মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয়ে যায়। মহানবী (সা.) নিজে দোয়া করে এর ভিত্তি প্রস্তর রাখেন এবং মসজিদে কুবার ন্যায় এখানেও সাহাবীরা মিস্ত্রি ও শ্রমিকের কাজ করেন আর এ কাজে কখনও কখনও মহানবী (সা.) নিজেও অংশগ্রহণ করতেন।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ২৬৯)

যেমনটি বলা হয়েছে, এই মসজিদ ও বাড়ির জন্য এই জায়গাটুকু মহানবী (সা.) দশ দিনারে ক্রয় করেছিলেন এবং বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু বকর (রা.)'র সম্পদ থেকে এই মূল্য পরিশোধ করা হয়েছিল।

(আলমোয়াহিবুল লাদানিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৬)

মসজিদ নির্মাণের ব্যাপারে আরো বিস্তারিত বিবরণ হল, নির্মাণ কাজ আরম্ভ হওয়ার সময় মহানবী (সা.) তাঁর পবিত্র হাতে একটি ইট স্থাপন করেন। এরপর তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-কে ডাকেন। তিনি (রা.) এসে মহানবী (সা.)-এর ইটের পাশে একটি ইট স্থাপন করেন। অতঃপর তিনি (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে ডাকেন। তিনি (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র স্থাপিত ইটের পাশে একটি ইট স্থাপন করেন এরপর হযরত উসমান (রা.) আসেন এবং তিনি হযরত উমর (রা.)'র ইটের পাশে একটি ইট স্থাপন করেন।

অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) যখন মসজিদ নির্মাণ করেন তখন তিনি (সা.) উক্ত মসজিদের ভিত্তি-মূলে একটি পাথর স্থাপন করেন আর হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলেন, তোমার পাথর আমার পাথর ঘেঁষে স্থাপন কর। এরপর তিনি হযরত উমর (রা.)-কে বলেন, তুমি তোমার পাথর আবু বকরের পাথরের সাথে রাখ, এরপর হযরত উসমান (রা.)-কে বলেন, তুমি তোমার পাথর উমরের পাথর-সন্নিবেশিত করে রাখ।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৯০)

৭ম হিজরীর মহররম মাসে মহানবী (সা.) যখন খয়বরের যুদ্ধ থেকে সফল ও বিজয়ীর বেশে ফিরে আসেন তখন তিনি মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ এবং নুতনভাবে নির্মাণের নির্দেশ প্রদান করেন। এবারও তিনি (সা.) সাহাবী (রা.)-দের সাথে মিলেমিশে মসজিদ নির্মাণে অংশগ্রহণ করেন।

(জুস্তজুয়ে মাদীনা, পৃ: ৪৪৬, ওরিয়েন্টল পাবলিকেশনস, পাকিস্তান)

উবায়দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন বাড়িঘরের জন্য জমি বরাদ্দ করেন তখন হযরত আবু বকর (রা.)'র জন্য তাঁর ঘরের জায়গা মসজিদ সংলগ্ন নির্ধারণ করেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯৩)

হযরত আবু বকর (রা.)'র ভ্রাতৃত্ব স্থাপন সম্পর্কিত বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর এবং হযরত খারেজা বিন যায়েদ (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেছিলেন।

(আল আসাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৯০)

এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেছেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯৩)

হযরত উমর (রা.)'র সাথে {হযরত আবু বকর (রা.)'র} ভ্রাতৃত্ব বন্ধন মক্কায় স্থাপিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে রেওয়ায়েতে বর্ণি ত হয়েছে যে, হযরত উমর (রা.)'র সাথে {হযরত আবু বকর (রা.)'র} ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের যে রেওয়ায়েত পাওয়া যায়, তা মূলত মক্কার ঘটনা ছিল। যেমন আল্লামা ইবনে আসাকির লিখেছেন, মহানবী (সা.) মক্কায় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ও উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেছিলেন। অতঃপর মহানবী (সা.) মদীনায় এসে দু'টি ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ব্যতীত সকল ভ্রাতৃত্ব বন্ধন রহিত করে দেন। সেই দু'টি ভ্রাতৃত্ব বন্ধন অটুট থাকে। এর একটি ছিল মহানবী (সা.) ও হযরত আলী (রা.)'র মাঝে এবং অপরটি হযরত হামযা (রা.) ও হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)'র মাঝে ছিল।

(তারিখে দামাস্ক আল কাবীর লি ইবনে আসাকির, খণ্ড-১৬, পৃ: ৬৩)

ভ্রাতৃত্ব বন্ধন কখন স্থাপিত হয়েছিল, এ সম্পর্কে ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, ভ্রাতৃত্ব বন্ধন দু'বার স্থাপিত হয়েছিল। সহীহ্ বুখারীর ভাষ্যকার আল্লামা কাস্তালানী বলেন, ভ্রাতৃত্ব বন্ধন দু'বার স্থাপিত হয়েছিল। প্রথমবার হিজরতের পূর্বে মক্কায় মুসলমানদের মাঝে (ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপিত) হয়। এতেমহানবী (সা.), হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.)'র মাঝে, হযরত হামযা (রা.) ও হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)'র মাঝে, হযরত

উসমান (রা.) ও হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)'র মাঝে, হযরত যুবায়ের ও হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.)' র সাথে এবং হযরত আলী (রা.) ও নিজের সাথে মহানবী (সা.) ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন। অতঃপর তিনি (সা.) যখন মদীনায় আসেন তখন হযরত আনাস বিন মালেক (রা.)'র গৃহে মুহাজির ও আনসারদের মাঝে নতুনভাবে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন। ইবনে সাদ (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি (সা.) একশ' জন সাহাবীর মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন, অর্থাৎ, পঞ্চাশ জন মুহাজির ও পঞ্চাশ জন আনসারের মাঝে।

(ইরশাদুস সারি, শারাহ বুখারী, ৭ খণ্ড, পৃ: ১৩৩)

বদরের যুদ্ধ ও হযরত আবু বকর (রা.): এ সম্পর্কে উল্লিখিত রয়েছে, দ্বিতীয় হিজরী সনের রমযান মাস মোতাবেক ৬২৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৩৪৯)

বদরের যু দ্ধে যাত্রার প্রাক্কালে সাহাবীদের কাছে কেবল সত্তরটি উট ছিল, তাই এক একটি উট তিনজনের জন্য নির্ধারিত ছিল এবং প্রত্যেকে পালাক্রমে (উটে) আরোহণ করতেন। হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.) এবং হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) একটি উটে পালাক্রমে আরোহণ করেন।

(আস সীরাতুল হালবিয়া, বাব যিকরু মাগাযিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ২০৪)

যখন তিনি (সা.) বদরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন সে সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলাকে প্রতিহত করার জন্য মদীনা থেকে বের হন– যে সিরিয়া থেকে ফিরে আসছিল। মুসলমানদের কাফেলা যখন মদীনার নিকটস্থ সাফরা উপত্যকার পার্শ্ববর্তী জাফরান উপত্যকায় পৌঁছে, তখন তিনি (সা.) কুরাইশদের সম্পর্কে জানতে পারেন যে, কুরাইশরা তাদের বাণিজ্য কাফেলার সুরক্ষার জন্য বেরিয়ে পড়েছে। মহানবী (সা.) সাহাবায়ে কেরামের (রা.) কাছে পরামর্শ চান এবং তাদেরকে অবগত করেন যে, মক্কা থেকে একটি সৈন্যবাহিনী অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে; এমতাবস্থায় তোমাদের মতামত কী? সৈন্যদলের বিপরীতে তোমাদের কাছে কি বাণিজ্য কাফেলার (মোকাবিলার করা) অধিক পছন্দনীয়? তারা বলেন, কেন নয়? একটি দল বলে, আমরা শত্রুর (সৈন্যদলের) মোকাবিলায় বাণিজ্য কাফেলাকে বেশি পছন্দ করছি। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, একটি দল বলে, আপনি আমাদেরকে যুদ্ধের কথা কেন বলেন নি? তাহলে আমরা এর প্রস্তুতি নিয়ে আসতাম। আমরা তো বাণিজ্য কাফেলার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছি। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনার বাণিজ্য কাফেলার দিকেই যাওয়া উচিত আর আপনি শত্রুর সেনাদলকে উপেক্ষা করুন। এর ফলে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেহারার রং বদলে হয়ে যায়। হযরত আবু আইয়্যুব (রা.) বর্ণনা করেন, كَمَآ اَخۡرَجَكَ رَبُّكَ مِنۡۢ بَيۡتِكَ بِالۡحَقِّ وَاِنَّ فَرِيۡقًا مِّنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ لَكٰرِهُوۡنَ (সূরা আল্ আনফাল: ৬) আয়াত উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে। উক্ত আয়াতের অর্থ হল, তোমার প্রভু প্রতিপালক তোমাকে সংগত উদ্দেশ্যেই তোমার বাড়ি থেকে বের করে এনেছিলেন, যদিও মু'মিনদের এক দল তা অবশ্যই অপছন্দ করতো। তখন হযরত আবু বকর (রা.) দণ্ডায়মান হন এবং অনেক চমৎকার বক্তব্য রাখেন। এরপর হযরত উমর (রা.) দণ্ডায়মান হন এবং অতি উত্তম বক্তব্য রাখেন। পুনরায় হযরত মিকদাদ (রা.) দাঁড়িয়ে বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আল্লাহ্ আপনাকে যে কাজের আদেশ দিয়েছেন সেদিকেই অগ্রসর হোন। আমরা আপনার সাথে আছি। আল্লাহ্র কসম! আমরা আপনাকে সেকথা বলব না যা বনী ইসরাঈল মূসা (আ.)-কে বলেছিল, فَاذۡهَبۡ اَنۡتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَاۤ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوۡنَ অর্থাৎ, যাও, তুমি আর তোমার প্রভু দু'জন মিলে যুদ্ধ কর, আমরা এখানেই বসে থাকব। (সূরা আল্ মায়েদা: ২৫) তিনি (রা.) বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দেহে প্রাণ আছে, আমরা আপনার সাথে মিলে যুদ্ধ করব। সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহকারে নবী মনোনীত করে প্রেরণ করেছেন। আপনি যদি আমাদেরকে 'বারকুল গিমাদ' পর্যন্তও নিয়ে যান তাহলে আমরাও আপনার সাথে যুদ্ধ করতে করতে প্রসন্ন চিত্তে সেখানে চলে যাব।

বারকু ল গিমাদ মক্কা থেকে পাঁচ রাত দূরত্বের একটি উপকূলীয় শহর। যাহোক, হযরত আবদল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মুখমণ্ডল দেখেছি, একথা শুনে তঁ ার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং তিনি এই কথায় অত্যন্ত আনন্দিত হন।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, বাব যিকরুল মাগাযিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ২০৫-২০৬) (আল মাজামুল বালদান, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৭৫)

এরপর মহানবী (সা.) জাফরান থেকে যাত্রা করে বদরের নিকটবর্তী স্থানে যাত্রা বিরতি করেন বা শিবির স্থাপন করেন। এরপর তিনি (সা.) এবং তাঁর সফরসঙ্গীদের একজন বাহনে আরোহণ করেন। সীরাত ইবনে হিশাম অনুযায়ী সেই ব্যক্তি ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.)। অন্য বর্ণনানুযায়ী হযরত আবু বকর (রা.)'র পরিবর্তে হযরত কাতাদা বিন নো'মান (রা.) অথবা হযরত মু'য়ায বিন জাবাল (রা.)'র উল্লেখ রয়েছে। এক পর্যায়ে তিনি (সা.) আরবের এক বৃদ্ধ ব্যক্তির কাছে গিয়ে থামেন এবং তাকে কুরাইশ এবং মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর সফরসঙ্গীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন যে, এদের সম্পর্কে তার কাছে কী তথ্য আছে?

(আসসীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৪২১) (আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ২০৭)

সবাই যখন বদরের প্রান্তরে একত্রিত হন তখন মহানবী (সা.) এর জন্য একটি তাঁবু খাটানো হয়েছিল। এটি তৈরি করা সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে,অওস গোত্রের নেতা সা'দ বিন মু 'য়াযের প্রস্তাবে সাহাবীরা বদর প্রান্তরের একটি অংশে মহানবী (সা.)-এর জন্য একটি তঁ াবু খাটিয়ে দেন এবং সা'দ (রা.) মহানবী (সা.)-এর বাহন তাঁবুর এক পার্শ্বে বেঁ ধে রেখে বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি এই তাঁবুতে বসুন আর আমরা আল্লাহ্র নাম নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করছি এবং হযরত সা'দ (রা.) সহ অন্যান্য কতিপয় আনসার সাহাবী পাহারা দেওয়ার জন্য দণ্ডায়মান হন। মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) এই তাঁবুতেই রাত্রি যাপন করেন। এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু বকর (রা.) তাঁবুতে নগ্ন তরবারি হাতে নিয়ে তাঁর নিরাপত্তার জন্য তাঁর (সা.) কাছে দাঁড়িয়ে থাকেন। আর মহানবী (সা.) সারারাত আল্লাহ্র দরবারে বিগলিত চিত্তে দোয়া করেন। উল্লেখ আছে যে, পুরো সৈন্যবাহীনির মাঝে একমাত্র তিনিই রাতভর জাগ্রত ছিলেন বাকী সবাই পালা করে ঘুমিয়ে নিয়েছেন।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৩৫৭) (সুবুলুল হুদা, ১১তম খণ্ড, পৃ: ৩৯৮)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র সাহসিকতা ও বীরত্ব সম্পর্কে হযরত আলী (রা.)'র একটি প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েত রয়েছে বা তিনি (রা.) বর্ণ না করেন যে, তিনি সাহাবীদের একটি দলকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমাকে মানুষের মাঝে সব থেকে বেশি সাহসী ব্যক্তি সম্পর্কে বলো। এর উত্তরে লোকেরা বলে, আপনি অর্থাৎ হযরত আলী। হযরত আলী (রা.) বলেন, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাহসী ব্যক্তি হলেন, হযরত আবু বকর (রা.)। বদরের যুদ্ধের সময় যখন আমরা মহানবী (সা.)-এর জন্য ছাউনি তৈরি করেছিলাম। তখন আমরা বললাম, কে আছে যে মহানবী (সা.)-এর সাথে থাকবে যাতে তাঁর (সা.) ধারে-কাছে কোন মুশরিক পেঁ ছিতে না পারে। আল্লাহ্র কসম! তখন আমাদের মধ্যে থেকে হযরত আবু বকর (রা.) ছাড়া আর কেউ মহানবী (সা.)-এর নিকটে যায়নি। তিনি তরবারি বের করে মহানবী (সা.) মাথার কাছে দণ্ডায়মান হন এবং বলেন, মহানবী (সা.)-এর ধারে-কাছে কোন মুশরিকের পৌঁছাতে হলে প্রথমে আবু বকরের সাথে লড়াই করতে হবে।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ২১৪)

এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত আলী (রা.) একদা বলেন, সাহাবীদের মাঝে সবচেয়ে বেশি সাহসী ও নির্ভীক ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.)। এরপর তিনি বলেন, বদরের যু দ্ধে যখন মহানবী (সা.)-এর জন্য একটি উঁচু যায়গা নির্ধারণ করা হয় তখন এই প্রশ্ন জাগে যে, আজ মহানবী (সা.)-এর নিরাপত্তার দায়িত্ব কার ওপর অর্পণ করা হবে। এতে হযরত আবু বকর (রা.) তৎক্ষণাৎ নগ্ন তরবারি নিয়ে দণ্ডায়মান হন আর তিনি সেই চরম বিপদের সময় পরম বীরত্বের সাথে তাঁর (সা.) নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেন।"

(তফসীরে কবীর, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩৬৪-৩৬৫)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বদরের যুদ্ধের দিন একটি বড় তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন, তখন তিনি (সা.) বলেন, اَللّٰهُمَّ اِنِّيۡ اَنۡشُدُكَ عَهۡدَكَ وَوَعۡدَكَ. اَللّٰهُمَّ اِنۡ شِئۡتَ لَمۡ تُعۡبَدۡ بَعۡدَ الۡيَوۡمِ অর্থাৎ, 'হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমাকে তোমারই প্রতিশ্রুতি ও তোমারই অঙ্গীকারের দোহাই দিচ্ছি। হে আমার প্রভু! যদি তুমিই মুসলমানদের ধ্বংস চাও তাহলে আজকের পর তোমার ইবাদতকারী কেউ (অবশিষ্ট) থাকবে না।' তখনই হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর হাত ধরে ফেলেন আর তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! এবার থামুন। আপনি আপনার প্রভুর কাছে দোয়াতে অনেক বেশি আকুতি-মিনতি করেছেন। তখন তিনি বর্ম পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। তিনি (সা.) তাঁবু হতে বের হন আর এই (আয়াত) পাঠ করছিলেন যে, سَيُهۡزَمُ الۡجَمۡعُ وَيُوَلُّوۡنَ الدُّبُرَ. بَلِ السَّاعَةُ مَوۡعِدُهُمۡ وَالسَّاعَةُ اَدۡهٰى وَاَمَرُّ অর্থাৎ, অচিরেই তাদের সবাই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। আর এটিই সেই ক্ষণ যা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছিল আর এই মুহূর্ত অত্যন্ত কঠোর এবং অত্যন্ত বিস্বাদ। (সূরা আল্ কামার: ৪৬-৪৭) (সহী বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস-২৯১৫)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.) বলেন, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, বদরের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.) মুশরিকদের দেখেন, যাদের সংখ্যা ছিল এক হাজার আর তাঁর সাহাবীদের সংখ্যা ছিল ৩১৯ জন। আল্লাহ্র নবী (সা.) ক্বি বলামুখী হয়ে নিজের উভয় হাত তুলেন

এবং নিজ প্রভুকে উচ্চস্বরে ডাকতে থাকেন যে, اَللّٰهُمَّ اَنْجِزْ لِيْ مَا وَعَدْتَّنِيْ اَللّٰهُمَّ اٰتِ مَا وَعَدْتَّنِيْ اَللّٰهُمَّ اِنْ تُهْلِكْ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ اَهْلِ الْاِسْلَامِ لَا تُعْبَدْ فِي الْاَرْضِ

অর্থাৎ, 'হে আমার আল্লাহ্! তুমি আমার সাথে যে অঙ্গীকার করেছ তা পূর্ণ কর। হে আমার আল্লাহ্! আমাকে তুমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা আমাকে দান কর। হে আমার আল্লাহ্! তুমি যদি মুসলমানদের এই দলটিকে ধ্বংস করে দাও তাহলে পৃথিবীর বুকে তোমার ইবাদত করা হবে না।' হাত তুলে ক্বিবলামুখী হয়ে (এভাবে) তিনি (সা.) অনবরত নিজ প্রভুকে উচ্চস্বরে ডাকতে থাকেন আর এক পর্যায়ে তাঁর চাদর তাঁর কাঁধ থেকে পড়ে যায়। তখন হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর কাছে আসেন আর তাঁর চাদর তাঁর কাঁধে তুলে দেন। অতঃপর তিনি (রা.) পিছন দিক থেকে মহানবী (সা.)-কে জড়িয়ে ধরেন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! নিজ প্রভুর সন্নিধানে আপনার কাকুতি-মিনতিপূর্ণ দোয়া আপনার জন্য যথেষ্ট। তিনি আপনার সাথে কৃত অঙ্গীকার অবশ্যই পূর্ণ করবেন। তখন আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন যে, اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّيْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ অর্থাৎ, স্মরণ কর যখন তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ফরিয়াদ করছিলে, তিনি তোমাদের ফরিয়াদ গ্রহণ করেছেন এই প্রতিশ্রুতির সাথে যে, আমি অবশ্যই এক হাজার সারিবদ্ধ ফিরিশ্‌তার মাধ্যমে তোমাদের সাহায্য করব। (সূরা আল্ আনফাল : ১০) অতএব, আল্লাহ্ তা'লা ফিরিশ্‌তাদের মাধ্যমে তাঁকে সাহায্য করেন। (সহী মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস-৪৫৮৮)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বদরের যুদ্ধের ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে এর বিশদ বিবরণ এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, মহানবী (সা.) সাহাবীদের সম্বোধন করে এ-ও বলেন যে, কাফিরদের সৈন্যদলে এমন কিছু লোকও রয়েছে যারা স্বেচ্ছায় এই যুদ্ধে আসেনি, বরং কুরাইশ নেতাদের চাপে পড়ে আসতে বাধ্য হয়েছে; মন থেকে তারা আমাদের বিরোধী নয়। তেমনিভাবে এমন কিছু লোকও এই সৈন্যদলে রয়েছে, যারা মক্কায় আমাদের বিপদের দিনে আমাদের সাথে ভদ্রোচিত ব্যবহার করেছিল; এখন আমাদের দায়িত্ব হল, তাদের অনুগ্রহের প্রতিদান দেওয়া। তাই যদি এমন কোন ব্যক্তির ওপর কোন মুসলমান প্রাধান্য বিস্তারে সক্ষম হয় সে যেন তার কোন ক্ষতি না করে। আর তিনি (সা.) বিশেষভাবে প্রথমোক্ত শ্রেণীর মাঝে আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মাঝে আবুল বাখতারী-র নাম উল্লেখ করেন এবং তাদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেন। কিন্তু এমন অনিবার্য পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে যে, আবুল বাখতারী নিহত হওয়া থেকে বাঁচতে পারেনি, অবশ্য মৃত্যুর পূর্বে সে জানতে পেরেছিল যে, মহানবী (সা.) তাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। সাহাবীদের একথা বলার পর তিনি (সা.) পুনরায় তাঁবুতে গিয়ে দোয়ায় মগ্ন হন। হযরত আবু বকর (রা.)ও তাঁর সাথে ছিলেন, আর তাঁবুর চারপাশে আনসারদের একটি দল সা'দ বিন মু'য়াযের নেতৃত্বে প্রহরায় নিযুক্ত ছিল। স্বল্পক্ষণ পরেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে হৈচৈ শোনা যায় এবং জানা যায় যে, কুরাইশ সৈন্যবাহিনী গণহামলা করতে শুরু করে দিয়েছে। তখন মহানবী (সা.) অত্যন্ত ব্যাকুলতার সাথে খোদা তা'লার দরবারে হাত তুলে দোয়া করছিলেন এবং আকুল কণ্ঠে বলছিলেন, اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَ وَعْدَكَ اَللّٰهُمَّ اِنْ تُهْلِكْ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ اَهْلِ الْاِسْلَامِ لَا تُعْبَدْ فِي الْاَرْضِ

অর্থাৎ, হে আমার আল্লাহ্! তোমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর! হে আমার মালিক, মুসলমানদের এই দলটি যদি আজ এখানে ধ্বংস হয়, তবে পৃথিবীতে তোমার ইবাদত করার কেউ থাকবে না। তখন তিনি (সা.) এতটা উৎকণ্ঠিত ছিলেন যে, কখনও তিনি সিজদায় লুটিয়ে পড়ছিলেন, কখনও দণ্ডায়মান অবস্থায় খোদা তা'লাকে ডাকছিলেন, আর তাঁর (সা.) চাদর তাঁর কাঁধ থেকে বারবার পড়ে যাচ্ছিল এবং হযরত আবু বকর (রা.) সেটি তাঁর (সা.) কাঁধে তুলে দিচ্ছিলেন। হযরত আলী (রা.) বলেন, যুদ্ধ করতে করতে আমার মহানবী (সা.)-এর কথা মনে পড়লে আমি দৌড়ে তাঁর (সা.) তাঁবুর দিকে যেতাম। কিন্তু আমি যতবারই গিয়েছি, তাঁকে (সা.) সিজদায় ক্রন্দনরত দেখতে পেয়েছি। আর আমি তাঁর (সা.) মুখ দিয়ে এই শব্দগুলো উচ্চারিত হতে শুনছিলাম- 'ইয়া হাইয়্যু-ইয়া কাইয়্যুম, ইয়া হাইয়্যু-ইয়া কাইয়্যুম' অর্থাৎ, হে আমার জীবন্ত খোদা! হে জীবনদাতা প্রভু! হযরত আবু বকর তাঁর (সা.) এই অবস্থা দেখে ব্যাকুল হয়ে যেতেন এবং নিজের অজান্তেই কখনও কখনও বলে উঠতেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল, আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত! আপনি বিচলিত হবেন না; আল্লাহ্ অবশ্যই নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন। কিন্তু সত্য প্রবাদ, 'হার কে আরেফ- তার আস্ত তারসাঁন-তার' অর্থাৎ, যে যত বেশি জানে সে ততবেশি ভয় পায়- অনু যায়ী মহানবী (সা.) অনবরত দোয়া ও ক্রন্দনে মগ্ন ছিলেন।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৩৬০-৩৬১)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, "বদরের সময় মহানবী (সা.)-এর যে আচরণ প্রকাশ পেয়েছে, তা-ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট! আর এ থেকে জানা যায় যে, তাঁর (সা.) হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার ভীতি কত বেশি ছিল! বদরের যুদ্ধের সময়, যখন শত্রুদের মোকাবিলায় তিনি (সা.) নিজের সাহসী ও নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীদের নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন, ঐশী সমর্থনের লক্ষণও স্পষ্ট ছিল; কাফিররা তাদের অবস্থান দৃঢ় করার জন্য শক্ত মাটিতে শিবির স্থাপন করেছিল আর মুসলমানদের জন্য বালুময় স্থান ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু খোদা তা'লা বৃষ্টি বর্ষিয়ে কাফিরদের শিবির কর্দমাক্ত করে দেন আর মুসলমানদের অবস্থানস্থল দৃঢ় হয়ে যায়। এমনিভাবে আরও অনেক ঐশী সাহায্য-সমর্থন প্রকাশ পাচ্ছিল, কিন্তু এতদসত্ত্বেও মহানবী (সা.)-এর হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার ভীতি এতটা প্রবল ছিল যে, সকল প্রতিশ্রুতি ও নিদর্শনাবলী থাকা সত্ত্বে ও খোদার অমুখাপেক্ষিতা দৃষ্টে তিনি বিচলিত ছিলেন এবং ব্যাকুল হয়ে খোদার সমীপে দোয়া করেছিলেন যে, মুসলমানদেরকে বিজয় দান কর। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, বদরের যুদ্ধে মহানবী (সা.) গোলাকার তাঁবুতে ছিলেন এবং দোয়া করছিলেন, হে আমার খোদা! আমি তোমাকে তোমার অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাচ্ছি এবং সেগুলো পূরণের প্রার্থনা করছি। হে আমার প্রভু -প্রতিপালক! তুমি-ই যদি মুসলমানদের ধ্বংস চাও তাহলে আজকের পর তোমার ইবাদত করার আর কেউ থাকবে না।

এতে হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর (সা.) হাত ধরে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! থামুন, আপনি তো আপনার প্রভুর নিকট দোয়ায় অত্যধিক আকুতিমিনতি করেছেন। তখন মহানবী (সা.) বর্ম পরিহিত ছিলেন। তিনি (সা.) তাঁবু থেকে বের হয়ে এসে বলেন, এখনই এই সৈন্যবাহিনী পরাজিত হবে; আর তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে। বরং এটাই তাদের পরিণতির সময় এবং এই সময় তাদের জন্য খুবই কঠিন ও তিক্ত। খোদাভীতির মান কেমন ছিল দেখুন! প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও খোদার অমুখাপেক্ষিতা দৃষ্টিপটে ছিল। কিন্তু বিশ্বাসও এরূপ ছিল যে, হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করতেই তিনি (সা.) উচ্চস্বরে বলেন, আমি ভয় পাই না, বরং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমি অবগত হয়েছি যে, শত্রুরা পরাজিত হয়ে লাঞ্ছিত হবে এবং কাফির নেতারা এখানেই মরবে; বাস্তবে তা-ই হয়েছে।"

(সীরাতুন নবী, আনোয়ারুল উলুম, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৬৬-৪৬৭)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'পবিত্র কুরআনে বার বার মহানবী (সা.)-কে কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বদরের যু দ্ধ যখন আরম্ভ হয়, যা ইসলামের প্রথম যুদ্ধ ছিল; তখন মহানবী (সা.) ক্রন্দন ও দোয়া করতে আরম্ভ করেন আর দোয়া করতে করতে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মুখ থেকে এই শব্দাবলী নিসৃত হয়, 'আল্লাহুম্মা ইন্ আহ্‌লাকতা হাযিহিল ই'সাবাতা ফালান্ তু'বাদ ফিল আরদে আবাদা' অর্থাৎ হে আমার খোদা! যদি আজ তুমি এই ৩১৩ জনের দলটিকে ধ্বংস করে দাও তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত কেউ তোমার ইবাদত করবে না। হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর মুখ থেকে এই শব্দাবলী নিঃসৃত হচ্ছে শুনে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কেন এত বিচলিত হচ্ছেন? আল্লাহ্ তা'লা তো আপনাকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আমি বিজয় দান করব। তিনি (সা.) বলেন, একথা সত্য; কিন্তু খোদার অমুখাপেক্ষিতা আমার দৃষ্টিপটে রয়েছে। অর্থাৎ, কোন প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা আল্লাহ্ তা'লার জন্য বাধ্যতামূলক নয়।'

(বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম ভাগ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড=২১, পৃ: ২৫৫-২৫৬)

প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হলে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসেন এবং লোকজনকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেন। লোকেরা তাদের সারিতে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করছিল। মহানবী (সা.) স্বয়ং যুদ্ধ করেন এবং তাঁর পাশাপাশি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)ও যুদ্ধরত ছিলেন।

তখন হযরত আবু বকর (রা.)'র অসাধারণ বীরত্ব সামনে আসে। তিনি (রা.) সকল বিদ্রোহী কাফিরের সাথে যুদ্ধ করার জন্যই প্রস্তুত ছিলেন, যদিও বা (সামনে) তার পুত্রই হোক না কেন। এই যুদ্ধে তাঁর পুত্র আব্দুর রহমান কাফিরদের পক্ষে যুদ্ধ করতে এসেছিল আর তাকে আরবের সবচেয়ে বড় বীরদের একজন মনে করা হতো এবং কুরাইশদের মাঝে তিরন্দাজিতে তিনি সর্বাধিক দক্ষ ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি তাঁর পিতা হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলেন, বদরের দিন আপনি আমার স্পষ্ট নিশানায় ছিলেন, কিন্তু আমি আপনার কাছ থেকে সরে যাই এবং আপনাকে হত্যা করি নি। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তুমি যদি আমার নিশানায় থাকতে তাহলে আমি তোমা থেকে সরতাম না।

(সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, শাখসীয়াত অউর কারনামে, প্রণেতা-আলি মহম্মদ সালাবী, পৃ: ১০৮-১০৯)

এর উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মু সলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,

"হযরত আবু বকর (রা.) একবার মহানবী (সা.)-এর সাথে খাবারের সময় উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে কথা আরম্ভ হয়। হযরত আব্দুর রহমান, যিনি হযরত আবু বকর (রা.)'র জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন এবং পরবর্তীতে মুসলমান হয়েছিলেন, তিনি বদর বা উহুদের যুদ্ধে কাফিরদের পক্ষ থেকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। খাবার খাওয়ার সময় কথায় কথায় তিনি বলেন, আব্বাজান! উক্ত যুদ্ধে

আপনি ওমুক স্থান দিয়ে অতিক্রম করছিলেন আর আমি তখন একটি পাথরের পেছনে লুকিয়ে বসে ছিলাম। আমি যদি চাইতাম তাহলে আক্রমণ করে আপনাকে হত্যা করতে পারতাম কিন্তু আমি ভাবলাম, নিজের পিতাকে হত্যা করব, তা কীভাবে হয়! হযরত আবু বকর (রা.) উত্তরে বলেন, আল্লাহ্ তোমাকে ঈমানে ধন্য করবেন বলে তুমি রক্ষা পেয়েছ বা তাই তুমি বেঁচে গেছ অন্যথায় আল্লাহ্‌র শপথ! আমি যদি তোমাকে দেখে ফেলতাম তবে নিশ্চিত হত্যা করতাম।"

(তফসীর কবীর, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৫৮৮)

বদরের যুদ্ধে বন্দীদের বিষয়ে মহানবী (সা.)-এর পরামর্শ গ্রহণ এবং হযরত আবু বকর (রা.)'র মতামত কী ছিল আর অন্যদের মতামতের উর্ধ্বে হযরত আবু বকর (রা.)'র পরামর্শ অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করা হয়েছে, এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন,মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে মহানবী (সা.) যুদ্ধবন্দীদের বিষয়ে পরামর্শ করেন যে, তাদের বিষয়ে কী করা উচিত? আরবে সাধারণত যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করা অথবা স্থায়ীভাবে দাস বানিয়ে রাখার প্রচলন ছিল; কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে মহানবী (সা.)-এর জন্য বিষয়টি ছিল খুবই অসহনীয়। এছাড়া তখনও এ বিষয়ে কোন ঐশী বিধান অবতীর্ণ হয় নি। হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, আমার মতে তাদেরকে ফিদিয়ার বিনিময়ে মুক্ত করে দেওয়া উচিত কেননা, এরা যে আমাদেরই ভাই বা বন্ধু। অসম্ভব নয় যে, কাল তাদের মধ্য থেকে ইসলামের জন্য আত্মনিবেদিত ব্যক্তি সামনে আসবে। কিন্তু হযরত উমর (রা.) উক্ত মতের বিরোধিতা করেন এবং বলেন, ধর্মীয় বিষয়ে আত্মীয়তার সম্পর্কের কোন গুরুত্ব থাকা উচিত নয় আর এরা নিজেদের কর্ম দ্বারা হত্যাযোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে। অতএব, আমার মতে তাদের সবাইকে হত্যা করা উচিত বরং প্রত্যেক মুসলমানকে নিজ হাতে নিজ আত্মীয়কে হত্যা করার আদেশ দেওয়া উচিত। মহানবী (সা.) নিজের স্বভাবজ দয়ার কারণে হযরত আবু বকর (রা.)'র পরামর্শ পছন্দ করেন এবং হত্যার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন এবং নির্দে শ দেন যে, যেসব মুশরিক নিজেদের মুক্তিপণ ইত্যাদি প্রদান করবে, তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়া হবে। অতএব, পরবর্তীতে তদনুযায়ী ঐশী আদেশ অবতীর্ণ হয়।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৩৬৭-৩৬৮)

মদীনায় একদা হযরত আবু বকর (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবীরা অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ বিষয়ে হযরত আয়েশা (রা.)'র একটি রেওয়ায়েত আছে। তিনি (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন মদীনায় আসেন তখন হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত বেলাল (রা.) জ্বরে আক্রান্ত হন। তিনি বলেন, আমি তাদের উভয়ের কাছে যাই এবং জিজ্ঞেস করি, বাবা! আপনার শরীর কেমন? আর বেলাল! তুমি কেমন আছ? তিনি বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) জ্বরে আক্রান্ত হলে যে পংক্তি পড়তেন তা হল, كُلُّ امْرِءٍ مُصَبَّحٌ فِيْ أَهْلِهٖ وَالْمَوْتُ أَدْنٰى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهٖ অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তি যে নিজ পরিবারের সাথে প্রভাতে জাগ্রত হয়, তার মঙ্গল কামনা করা হয় আর বাস্তব অবস্থা হল, মৃত্যু তার জুতার ফিতার চেয়েও নিকটতর হয়ে থাকে। আর হযরত বেলাল (রা.)'র জ্বর নেমে গেলে কান্নাকাটি করে উচ্চস্বরে কতক এমন কবিতা আবৃত্তি করতেন যাতে মক্কার আশপাশের বসতিগুলোর উল্লেখ থাকতো আর সেগুলোকে স্মরণ করতেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে যাই আর হযরত আবু বকর (রা.) কী বলেছেন ও হযরত বেলার (রা.) কী বলেছেন তা তাঁকে (সা.) খুলে বলি। তখন মহানবী (সা.) দোয়া করেন, "হে আল্লাহ্! আমাদের কাছে মদীনাকেও ঠিক তেমনই প্রিয় বানিয়ে দাও যেভাবে মক্কা আমাদের প্রিয় অথবা ততোধিক প্রিয় এবং একে (তথা মদীনাকে) স্বাস্থ্যকর স্থান বানিয়ে দাও আর আমাদের জন্য এর সা' এবং 'মুদ' -এ প্রভূত কল্যাণ রেখে দাও। 'মুদ' এবং সা' ওজনের পরিমাপ। এর জ্বরকে এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে জুহফার দিকে স্থানান্তরিত করে দাও। জুহফা মক্কা থেকে মদীনার দিকে ৮২ মাইল দুরের একটি স্থান।

(সহী বুখারী, কিতাবু মানাকিবুল আনসার, হাদীস-৩৯২৬) (শারাহ যুরকানী, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৭২)

উহুদের যুদ্ধ সম্পর্কে কিছু বর্ণনা রয়েছে। তিন হিজরী মোতাবেক ৬২৪ সালের শওয়াল মাসে মুসলমান এবং মক্কার কুরাইশদের মাঝে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তৃতীয় হিজরীর শেষপ্রান্তে মক্কার কুরাইশ এবং তাদের মিত্র গোত্রগুলোর সমন্ব য়ে গঠিত সৈন্যবাহিনীর মদীনায় চড়াও হওয়ার সংবাদ পেয়ে মহানবী (সা.) মুসলমানদেরকে একত্রিত করে কুরাইশদের আক্রমণ সম্পর্কে অবগত করে তাদের কাছে পরামর্শ চান যে, মদীনায় থেকে তাদের মোকাবিলা করা উচিত নাকি বাইরে বের হওয়া সমীচীন হবে?

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৪৮৩-৪৮৪)

এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এভাবে লিখেছেন, "মহানবী (সা.) মুসলমানদেরকে একত্রিত করে তাদের কাছে কুরা্ইশদের এই আক্রমণ সম্পর্কে পরামর্শ চান যে, মদীনাতেই থাকা উচিত নাকি বাইরে বের হয়ে যুদ্ধ করা সমীচীন হবে? পরামর্শ গ্রহণের পূর্বে মহানবী (সা.) কুরাইশদের আক্রমণ এবং তাদের পাশবিক অভিপ্রায়ের উল্লেখ করেন এবং বলেন, আজ রাতে আমি স্বপ্নে একটি গাভী দেখেছি এবং আমি আরও দেখেছি, আমার তরবারির অগ্রভাগ বা নখ ভেঙ্গে গেছে। পুনরায় আমি দেখেছি, সেই গাভীটি জবাই করা হচ্ছে। আমি দেখেছি যে, আমি নিজের হাত একটি সুদৃঢ় এবং সুরক্ষিত বর্মের ভেতর প্রবেশ করিয়েছি। আরেকটি রেওয়ায়েতে এটিও উল্লেখ আছে যে, তিনি (সা.) বলেন, আমি একটি ভেড়া দেখেছি যার পিঠে আমি আরোহণ করেছি। সাহাবীরা নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি এই স্বপ্নের কী ব্যাখ্যা করেছেন? তিনি (সা.) বলেন, গাভী জবাই হওয়ার মাধ্যমে আমি মনে করি, আমার সাহাবীদের মাঝে কতিপয় শহীদ হবেন এবং আমার তরবারির নখ ভেঙ্গে যাওয়ার মাধ্যমে আমার আত্মীয়দের মাঝে কারও শাহাদতের প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে অথবা হয়ত এই অভিযানে আমার কোন ক্ষতি হবে এবং বর্মের মধ্যে হাত ঢুকানোর মাধ্যমে আমি মনে করি, এই আক্রমণ মোকালিবার জন্য আমাদের মদীনার অভ্যন্তরে অবস্থান করা অধিক যুক্তিযুক্ত হবে এবং ভেড়ার ওপর আরোহণ সংক্রান্ত স্বপ্নের ব্যাখ্যা যা তিনি প্রদান করেছেন তা হল, এর ফলে কাফির বাহিনীর নেতা অর্থাৎ পতাকাবাহী মুসলমানদের হাতে নিহত হবে, ইনশাআল্লাহ্।

এরপর তিনি (সা.) সাহাবীদের কাছে পরামর্শ চান যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে কি করা উচিত? কতিপয় জ্যেষ্ঠ সাহাবী পরিস্থিতির স্পর্শকাতরতা উপলব্ধি করে এবং সম্ভবত মহানবী (সা.)-এর স্বপ্নে কিছুটা প্রভাবিত হয়ে এই মতামত দেন যে, মদীনার ভেতরে থেকে মোকাবিলা করাই যুক্তিযুক্ত হবে। মহানবী (সা.)ও এই পরামর্শ পছন্দ করেন এবং বলেন, আমারও মনে হয়, আমাদের মদীনার অভ্যন্তরে থেকেই তাদের মোকাবিলা করা উত্তম হবে। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী, বিশেষভাবে যুবকদের একদল যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি এবং নিজেদের শাহাদতের মাধ্যমে ধর্মসেবার সুযোগ লাভের বিষয়ে ব্যাকুল ছিলেন, তারা জোর দিয়ে বলেন, শহরের বাইরে বের হয়ে খোলা মাঠে লড়াই করা উচিত। তারা এতটা জোরালোভাবে নিজেদের প্রস্তাব উপস্থাপন করেন যে, মহানবী (সা.) তাদের উদ্দীপনা দেখে তাদের কথা মেনে নেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, আমরা খোলা মাঠে বেরিয়ে কাফিরদের মুখোমুখী হব আর জুমুআর নামাযের পর মুসলমানদের মাঝে সাধারণ ঘোষণা দেন যেন তারা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ্ (অর্থাৎ, আল্লাহর পথে জিহাদ)-এর উদ্দেশ্যে এই যুদ্ধে যোগদান করে পুণ্য অর্জন করে। এরপর তিনি ভেতরে চলে যান। হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.)'র সাহায্যে পাগড়ী বাঁধেন এবং পোশাক পরিধান করেন, এরপর অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে বাইরে আসেন, কিন্তু ইতিমধ্যে পূর্বে উল্লিখিত যুবকরা কতিপয় সাহাবীর কথার ফলে নিজেদের ভুল বুঝতে পারে যে, মহানবী (সা.)-এর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নিজেদের মতের ওপর জোর দেওয়া উচিত হয় নি। এ চেতনা হওয়ার পর তাদের বেশির ভাগ অনুতপ্ত ছিল। তারা যখন মহানবী (সা.)-কে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত মোটা লৌহবর্ম ও শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি পরিহিত অবস্থায় আসতে দেখে তখন তারা আরো বেশি লজ্জিত হয় আর সবাই একবাক্যে নিবেদন করে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাদের ভুল হয়ে গেছে কেননা , আমরা আপনার মতামতের বিরুদ্ধে নিজেদের মত নিয়ে পীড়াপীড়ি করেছি। আপনি যেভাবে সঠিক মনে করেন সেভাবেই কার্যক্রম পরিচালনা করুন। এর মাঝেই কল্যাণ হবে, ইনশাআল্লাহ্।

মহানবী (সা.) বলেন, এটি আল্লাহ্‌র নবীর মর্যাদা পরিপন্থী যে, তিনি একবার অস্ত্র ধারণ করে তা আবার খুলে ফেলবেন, যদি না খোদা নিজে কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। অতএব , এখন আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে যাত্রা কর আর তোমরা যদি ধৈর্য অবলম্বন কর তাহলে নিশ্চিত জেনে রেখ! আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য তোমাদের সাথে থাকবে।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৪৮৪-৪৮৬)

উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.) নিজের তরবারি হাতে নিয়ে বলেন, কে আছে যে এর প্রতি সুবিচার করবে? সেসময় যেসব সাহাবী সেই তরবারি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন তাদের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.)ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

(শারাহ যারকানী আল মোয়াহিবুল লাদানিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪০৪)

সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এ ঘটনার উল্লেখ এভাবে করেছেন যে,মহানবী (সা.) স্বীয় তরবারি হাতে নিয়ে বলেন, কে আছে যে এটি নিয়ে এর প্রতি সুবিচার করবে? অনেক সাহাবী এই সম্মানের বাসনায় নিজেদের হাত উঁচু করেন। যাদের মাঝে হযরত উমর (রা.) এবং হযরত যুবায়ের (রা.) ছিলেন বরং রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত আলী (রা.)-ও অন্তর্ভু ক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি (সা.) তা কাউকে দেয়া হতে বিরত থাকেন এবং বলতে থাকেন, কে আছে যে এটি নিয়ে এর প্রতি সুবিচার করবে? পরিশেষে হযরত আবু দুজানাহ্ আনসারী (রা.) নিজের হাত বাড়িয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাকে এটি দান করুন। তিনি (সা.) এই তরবারি তার হাতে তুলে দেন।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৪৮৯)

উহুদের যুদ্ধে কাফিররা যখন পুনরায় আক্রমণ করে আর মুসলমানদের পরাজয় বরণ করতে হয় তখন মহানবী (সা.) সম্পর্কে এই খবর ছড়িয়ে পড়ে

যে, তিনি (সা.) শহীদ হয়ে গেছেন। ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর শাহাদতের ঘটনা এবং কিছু মানুষের ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ার পর সর্বপ্রথম হযরত কা'ব বিন মালিক (রা.)'র দৃষ্টি মহানবী (সা.)-এর ওপর পড়ে। তিনি বর্ণনা করেন, আমি শিরস্ত্রাণের মধ্য থেকে তাঁর (সা.) উজ্জ্বল চোখ দু'টি দেখতে পেয়ে উচ্চস্বরে বলি, হে মুসলমানেরা! আনন্দিত হও, কেননা মহানবী (সা.) এখানে (আছেন)। এটি শুনে মহানবী (সা.) হাতের ইশারায় বলেন, চুপ থাকো। মুসলমানেরা যখন মহানবী (সা.)-কে চিনতে পারে তখন মহানবী (সা.) সঙ্গীসাথী নিয়ে গিরিপথের দিকে রওয়ানা হন। তাঁর (সা.) সাথে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.), হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.) এবং হযরত হারেসা বিন সিমা প্রমুখ সাহাবীরা ছিলেন।

(তারিখে তাবারী লি আবি জাফর বিন জারীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭০)

মহানবী (সা.) উহুদের যুদ্ধের দিন তাঁর সাহাবীদের একটি দলের কাছ থেকে মৃত্যুর শর্তে বয়আ'ত গ্রহণ করেন। মুসলমানেরা বাহ্যত যখন পিছপা হচ্ছিল তখন এই সাহাবীরা অনঢ়-অবিচল ছিলেন আর জীবন বাজি রেখে মহানবী (সা.)-এর সুরক্ষা করেন এমনকি তাদের মাঝে কয়েকজন সাহাবী শহীদ হয়ে যান। সেই বয়আ'তকারী সৌভাগ্যশালীদের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত তালহা (রা.), হযরত যুবায়ের (রা.), হযরত সা'দ (রা.), হযরত সাহল বিন হুনাইফ (রা.) এবং হযরত আবু দুজানাহ্ (রা.) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

(আল আসাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৩১, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরূত, ২০০৫)

উহুদের যুদ্ধের অবস্থা বর্ণ না করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) আরও লিখেন,

"যেসব সাহাবী মহানবী (সা.)-এর চতুষ্পার্শ্বে সমবেত ছিলেন এবং তাঁরা আত্মোৎসর্গের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন- ইতিহাসে এর কোন দৃষ্টান্ত নেই। তাঁরা পতঙ্গের ন্যায় মহানবী (সা.)-এর চতুষ্পার্শ্বে ঘুরছিলেন এবং তাঁর জন্য নিজেদের জীবনকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিচ্ছিলেন। যে আঘাতই আসত সাহাবীরা তা বুক পেতে বরণ করতেন এবং মহানবী (সা.)-কে রক্ষা করতেন আর একই সাথে শত্রুর ওপরও আঘাত হানতেন। হযরত আলী (রা.) এবং যুবায়ের (রা.) বহু শত্রুর ওপর আক্রমণ করেন এবং তাদের সারিগুলোকে পিছু হটিয়ে দেন। হযরত আবু তালহা আনসারী (রা.) তির ছুড়তে ছুড়তে তিনটি ধনুক ভেঙ্গে ফেলেন এবং শত্রুদের তিরের সামনে পরম বীরত্বের সাথে মহানবী (সা.)-এর শরীরকে নিজে ঢাল হয়ে আড়াল করে রাখেন। হযরত সা'দ বিন ওয়াক্কাস (রা.)'র হাতে মহানবী (সা.) নিজে তির তুলে দিচ্ছিলেন আর সা'দ (রা.) এসব তির অবিরামভাবে শত্রুদের ওপর ছুড়ে মারছিলেন। একবার তিনি (সা.) সা'দ (রা.)-কে বলেন, তোমার জন্য আমার পিতামাতা নিবেদিত, তুমি অনবরত তির ছুড়তে থাক। মহানবী (সা.)-এর এই কথাগুলো জীবনের শেষদিন পর্যন্ত হযরত সা'দ (রা.) অত্যন্ত গর্বের সাথে বলতেন। হযরত আবু দুজানা (রা.) অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিজের শরীর দিয়ে মহানবী (সা.)-এর শরীর মোবারক আড়াল করে রাখেন আর যে তির বা পাথরই আসত সেটির সামনে নিজের শরীর পেতে দিতেন। এভাবে তার শরীর তিরের আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় কিন্তু তিনি (রা.) উফ্ শব্দটিও করেন নি যেন এমন না হয় যে, তার শরীর নড়ে যাওয়ার ফলে মহানবী (সা.)-এর শরীরের কোন অংশ ঝুঁকির মুখে পড়ে আর কোন তির এসে তাঁর গায়ে বিদ্ধ হয়। হযরত তালহা (রা.) মহানবী (সা.)-কে রক্ষা করার জন্য অনেকগুলো আঘাত নিজ দেহে বরণ করেছেন এবং এই প্র চেষ্টাতেই তার হাত অসাড় হয়ে সারা জীবনের জন্য অকেজো হয়ে গেছে। কিন্তু এই গুটিকতক নিবেদিতপ্রাণ মানুষ আর কতক্ষণ এমন বিরাট প্লাবনের সামনে টিকতে পারত যা প্রতিটি ক্ষণেই চতুর্দিক থেকে ভয়ানক তরঙ্গের ন্যায় আছড়ে পড়ছিল। শত্রুদের প্রতিটি আক্রমণের প্রতিটি ঢেউ মুসলমানদেরকে অনেক দূরে বয়ে নিয়ে যেত কিন্তু তী ব্রতা কিছুটা কমলেই অসহায় মুসলমানরা যুদ্ধ করতে করতে পুনরায় তাদের প্রিয় মনিবের পাশে এসে জমা হত। কোন কোন সময় তো এমন ভয়ঙ্কর আক্রমণ হত যে, মহানবী (সা.) কার্যত একা থেকে যেতেন। যেমন এমন একটি সময় আসে যখন মহানবী (সা.)-এর চারপাশে কেবল বারো জন সাহাবী ছিলেন। আবার একবার এমন সময়ও আসে যখন তাঁর সাথে কেবল দু'জন লোকই ছিল। এসব নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীর মাঝে হযরত আবু বকর (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত তালহা (রা.), হযরত যুবায়ের (রা.), হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস(রা.), হযরত আবু দুজানা আনসারী (রা.), হযরত সা'দ বিন মু'য়ায (রা.) এবং হযরত তালহা আনসারী (রা.)'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৪৯৫-৪৯৬)

উহুদের যু দ্ধকালে যখন মহানবী (সা.)-এর দাঁত মোবারক শহীদ হয় তখনকার যে চিত্র হযরত আবু বকর (রা.) অঙ্কন করেছেন সে সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রা.) যখন উহুদের যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করতেন তখন তিনি বলতেন, সেই দিনটি পুরোটাই তালহার ছিল। এরপর এর বিশদ বিবরণ দিয়ে বলতেন, আমি তাদের একজন ছিলাম যারা উহুদের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.)-এর নিকট ফিরে এসেছিল। সেই সময় আমি দেখি, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর সুরক্ষায় তঁ ার সাথে যুদ্ধ করছে। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন, মহানবী (সা.)-কে তিনি রক্ষা করছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হায়! এই ব্যক্তি যদি তালহা হত! আমার হাত থেকে যে সুযোগ ছুটে গেছে তা তো গেছেই। তাই আমি মনে মনে বলি, আমার বংশের কোন লোক হলে এটি আমার কাছে সবচেয়ে পছন্দের হবে। এ ছিল তখন হযরত আবু বকর (রা.)'র ভাবনা। তিনি (রা.) বলেন, আমার এবং মহানবী (সা.)-এর মাঝে এক ব্যক্তি ছিল যাকে আমি চিনতে পারি নি। অথচ সেই ব্যক্তির তুলনায় আমি মহানবী (সা.)-এর অধিক নিকটে ছিলাম। সে যত দ্রুত হাঁটছিল আমার জন্য সেভাবে হাঁটা সম্ভব ছিল না। পরে দেখি, সেই ব্যক্তি হলেন, আবু উবায়দাহ্ বিন জারাহ্ (রা.)। এরপর আমি মহানবী (সা.)-এর নিকট গিয়ে দেখি তাঁর কর্তন দাঁত, অর্থাৎ সামনের দু'টি দাঁত অর্থাৎ, ছেদন দাঁতের মাঝের দাঁত ভেঙে গিয়েছিল আর মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত ছিল। মহানবী (সা.)-এর পবিত্র গালে (অর্থাৎ, চোয়ালে) শিরস্ত্রাণের কড়াগুলো ঢুকে গিয়েছিল। মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা দু'জনই তোমাদের সঙ্গীকে সাহায্য কর। অর্থাৎ, তিনি (সা.) তালহার কথা বলছিলেন। তাঁর (শরীর থেকে) অনেক রক্ত ঝরছিল। মহানবী (সা.) নিজের খেয়াল রাখতে বলার পরিবর্তে বলেন, তালহার খেয়াল রাখ। আমরা তাকে এভাবেই থাকতে দেই এবং সামনে অগ্রসর হই যেন মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মুখমণ্ডল থেকে শিরস্ত্রাণের কড়াগুলো বের করতে পারি। এটি দেখে হযরত আবু উবায়দাহ্ (রা.) বলেন, আমি আপনাকে আমার অধিকারের দোহাই দিচ্ছি, এ (কাজ)টি আপনি আমার জন্য রেখে দিন। ফলে আমি ক্ষান্ত দিই। হযরত আবু উবায়দাহ্ (রা.) সেই কড়াগুলোকে হাত দিয়ে টেনে বের করা অপছন্দ করেন, কেননা, এতে মহানবী (সা.)-এর কষ্ট হতে পারে। এজন্য তিনি সেই কড়াগুলোকে তার দাঁত দিয়ে বের করার চেষ্টা করেন। একটি কড়া বের করলে সেই কড়ার সাথেতার সামনের পাটির একটি দাঁতও ভেঙ্গে যায়। এরপর অপর কড়াটি বের করার জন্য আমি অগ্রসর হই যেন আমিও তেমনই করি যেমনটি তিনি করেছেন। অর্থাৎ, হযরত আবু বকর (রা.) বলছেন, আমি ভাবলাম, অন্য কড়াটি বের করার জন্য আমিও সেভাবে চেষ্টা করি। কিন্তু তখনও হযরত আবু উবায়দাহ্ (রা.) বলেন, আপনাকে আমার অধিকারের কসম দিচ্ছি! এই কাজটি আপনি আমাকে করতে দিন। (এ কথাগুলো) তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলেন। এতে হযরত আবু বকর (রা.) পিছনে সরে এলে পুনরায় তিনি তেমনই করেন যেমনটি তিনি পূর্বে করেছিলেন। ফলে হযরত আবু উবায়দাহ্ (রা.)'র সামনের অন্য দাঁতটিও কড়ার সাথে ভেঙ্গে যায়। অতএব, আবু উবায়দাহ্ (রা.) ছিলেন সামনের দাঁত ভাঙ্গা লোকদের মাঝে সবচেয়ে সুদর্শন মানুষ।

এরপর আমরা মহানবী (সা.)-এর চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষা শেষ করে হযরত তালহা (রা.)'র নিকট আসি। তিনি একটি ছোট্ট খাদে পড়ে ছিলেন। আমরা দেখি, তার শরীরে কমপক্ষে ৭০টি বর্শা, তরবারি ও তিরের আঘাত ছিল এবং তার আঙ্গুলও কাটা পড়ে ছিল। অতএব, আমরা তার ক্ষতে মলম লাগিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিই।

(সুবুলুল হুদা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৯৯-২০০) (লুগাতুল হাদীস, রুবাই নুমানী শব্দের টিকা)

হযরত আবু উবায়দাহ্ (রা.) ছাড়াও হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উকবাহ্ বিন ওয়াহাব (রা.) সম্পর্কেও রেওয়ায়েত রয়েছে যে, তারা এই কড়াগুলো বের করেছিলেন।

(শারাহ যারকানি, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪২৫, গাযওয়ায়ে ওহদ)

যাহোক, প্রথম রেওয়ায়েতটি অধিক গ্রহণযোগ্য।

উহুদের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.) যখন সাহাবীদের সাথে পাহাড়ে আরোহণ করেন তখন কাফিররাও তাঁর পিছনে পিছনে আসে। যেমন সহীহ্ বুখারীতে রেওয়ায়েত রয়েছে যে, আবু সুফিয়ান তিনবার চিৎকার করে জানতে চায়, এসব লোকের মাঝে কি মুহাম্মদ (সা.) আছে? তখন মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে উত্তর দিতে নিষেধ করেন। এরপর সে চেঁচিয়ে তিনবার জিজ্ঞেস করে, লোকদের মধ্যে কি আবু কোহাফার পুত্র, অর্থাৎ আবু বকর আছে? পুনরায় তিনবার জিজ্ঞেস করে, এসব লোকের মাঝে ইবনে খাত্তাব, অর্থাৎ উমর (রা.) আছে কি? এরপর সে তার সাঙ্গপাঙ্গদের কাছে ফিরে গিয়ে বলে, এরা যারা ছিল তাদের সবাই মারা গেছে। একথা শুনে হযরত উমর (রা.) নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে বলে উঠেন, হে আল্লাহ্‌র শত্রু! আল্লাহ্‌র কসম! তুমি মিথ্যা বলেছ। যাদের নাম তুমি নিয়েছ তারা সবাই জীবিত আর যেসব বিষয় তোমার কাছে অসহনীয় এমন অনেক কিছুই এখনও তোমার দেখার বাকি।

(সহী বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সীয়ার, হাদীস-৩০৩৯)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) মহানবী (সা.)-এর আহত হয়ে অজ্ঞান হওয়ার এবং এর পরের ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে একস্থানে লিখেন,

কিছুক্ষণ পরই মহানবী (সা.)-এর জ্ঞান ফিরে আসে আর সাহাবীরা যুদ্ধক্ষেত্রের চারিদিকে বার্তাবাহকের মাধ্যমে এই সংবাদ পৌঁছে দেন যেন মুসলমানরা পুনরায় দলবদ্ধ হয়। বিক্ষিপ্তবিচ্ছিন্ন সৈন্যদল পুনরায় একত্রিত হতে আরম্ভ করে এবং মহানবী (সা.) তাদেরকে সাথে নিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে চলে যান। যখন পাহাড়ের পাদদেশে মুসলমান সৈন্যদলের অবশিষ্ট কিছু সৈন্যকে আবু সুফিয়ান দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তখন সে বেশ উচ্চস্বরে ঘোষণা দেয় যে, আমরা মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করেছি। মহানবী (সা.) আবু সুফিয়ানের এই কথার কোন উত্তর দেন নি, পাছে শত্রুরা মুসলমানদের আসল অবস্থা বুঝতে পেরে পুনরায় আক্রমণ করে বসে আর আহত মুসলমানরা পুনরায় শত্রুদের আক্রমণের শিকারে পরিণত হয়। যখন ইসলামি সৈন্যদলের কাছ থেকে এই ঘোষণার কোন প্রত্যুত্তর না আসে তখন আবু সুফিয়ানের এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্ম নেয় যে, তার ধারণা সঠিক এবং সে বেশ উচ্চস্বরে ঘোষণা দিয়ে বলে, আমরা আবু বকরকেও হত্যা করেছি। মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কেও কোন উত্তর না দেয়ার আদেশ দেন। এরপর আবু সু ফিয়ান ঘোষণা করে, আমরা উমরকেও হত্যা করেছি। এটি শুনে হযরত উমর (রা.), যিনি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ একজন মানুষ ছিলেন, উত্তরে বলে উঠতে উদ্যত হন যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জীবিত আছি এবং তোমাদের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত আছি, কিন্তু মহানবী (সা.) বারণ করে বলেন, মুসলমানদের কষ্টে নিপতিত করো না আর চুপ থাক। তখন কাফিররা নিশ্চিত হয়ে যায় যে, ইসলামের প্র তিষ্ঠাতা এবং তাঁর ডান ও বাম বাহু (খ্যাত যারা ছিল তাদের)কেও আমরা মেরে ফেলেছি। এ কারণে আবু সুফিয়ান এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা আনন্দে ধ্বনি উচ্চকিত করে বলে, ওলো হুবল, ওলো হুবল, অর্থাৎ আমাদের সম্মানিত প্রতিমা হুবলের মর্যাদা উন্নীত হোক, কেননা সে আজ ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, সেই মহানবী (সা.) যিনি তাঁর নিজের মৃত্যুর ঘোষণা এবং হযরত আবু বকর ও উমর (রা.)'র মৃত্যুর ঘোষণা শুনেও নীরব থাকার উপদেশ দিচ্ছিলেন পাছে এমনটি যেন না হয় যে, আহত মুসলমানদের ওপর কাফির সৈন্যরা পুনরায় আক্রমণ করে বসে আর হাতেগোণা মুসলমানরা তাদের হাতে শহীদ হয়ে যায়। কিন্তু এখন যখন এক ও অদ্বিতীয় খোদার সম্মানের প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে এবং শির্কের জয়ধ্বনি উচ্চকিত করা হচ্ছে তখন তাঁর অন্তর ব্যাকুল হয়ে যায় আর তিনি (সা.) সাহাবীদের দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত আবেগের সাথে বলেন, তোমরা উত্তর দিচ্ছ না কেন? সাহাবীরা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা কী বলব? তখন তিনি (সা.) বলেন, বলো! আল্লাহু আ'লা ওয়া আজাল, আল্লাহু আ'লা ওয়া আজাল। অর্থাৎ, তোমরা মিথ্যা বলছো, হুবলের মর্যাদা উন্নীত হয়েছে- এটি তোমাদের মিথ্যা কথা। বরং এক এবং অদ্বিতীয় আল্লাহ্-ই পরম সম্মানিত আর তাঁর সম্মানই অতি মহান। এভাবে তিনি (সা.) তাঁর জীবিত থাকার সংবাদও শত্রুদের কাছে পৌঁছে দেন। কাফির সৈন্যদের ওপর এই বীরত্বপূর্ণ ও সাহসী উত্তরের এত গভীর প্র ভাব পড়ে যে, যদিও এই উত্তরের ফলে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ধূলিস্যাৎ হয় এবং তাদের সামনে হাতেগোণা কয়েকজন আহত মুসলমান দাঁড়িয়ে ছিল যাদের ওপর আক্রমণ করে তাদেরকে মেরে ফেলা জাগতিক হিসেবের দৃষ্টিকোন থেকে একেবারেই সম্ভব ছিল কিন্তু (তারা) পুনরায় আক্রমণ করার সাহসই দেখাতে পারে নি। বরং যতটুকু বিজয় তাদের লাভ হয়েছিল ততটুকুর জন্যই আনন্দ উল্লাস করতে করতে তারা মক্কায় ফেরত চলে যায়।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৫২-৫৩)

হযরত আয়েশা (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন, اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۛ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ (সূরা আলে ইমরান: ১৭৩) এটি সাহাবীদের সম্পর্কিত আয়াত- একথা তিনি (রা.) বলেন। অর্থাৎ, যারা আহত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে আর তাদের মধ্য হতে যারা পুণ্যকর্ম করেছে এবং খোদাভীতি অবলম্বন করেছে তাদের জন্য মহা প্রতিদান রয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) উরওয়াহ্‌কে বলেন, হে আমার ভাগ্নে! তোমার পিতৃপুরুষ যুবায়ের এবং হযরত আবু বকর (রা.)ও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, অর্থাৎ উহুদের যুদ্ধে যখন মহানবী (সা.) আহত হন এবং মুশরিকরা ফিরে যায় তখন তিনি (সা.) আশংকা করেন যে, এরা আবার ফিরে না আসে। তখন তিনি (সা.) বলেন, কে এদের পশ্চাদ্ধাবন করবে? তখন তাদের মধ্য হতে ৭০ জন নিজেদেরকে উপস্থ াপন করেন। উরওয়াহ্ বলতেন, তাদের মধ্যে হযরত আবু বকর এবং হযরত যুবায়ের (রা.)ও ছিলেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হাদীস-৪০৭৭)

এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন,

এটি একটি অদ্ভুদ বিষয়! বাহ্যত তখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাইশরা বিজয়ী ছিল আর বাহ্যিক উপকরণাদির নিরিখে চাইলে তারা এই বিজয়কে কাজে লাগাতে পারত এবং মদীনার ওপর আক্রমণ করার পথ তো তাদের জন্য খোলা ছিলই। কিন্তু এমন ঐশী কুদরত প্রকাশিত হয় যে, এই বিজয় সত্ত্বেও কুরাইশদের হৃদয় ভেতরে ভেতরে ত্রস্ত ছিল, তাই উহুদের ময়দানে অর্জিত তাদের এই বিজয়কেই তারা অনেক বড় প্রাপ্তি জ্ঞান করে অতি দ্রুত মক্কায় ফিরে যাওয়াকেই সঙ্গত মনে করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মহানবী (সা.) অধিক সতর্কতাবশত ত্বড়িৎ ৭০জন সাহাবীর একটি দল প্রস্তুত করে কুরাইশ সেনাদলের পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরণ করেন, যাদের মধ্যে হযরত আবু বকর এবং হযরত যুবায়ের (রা.)ও ছিলেন। এটি বুখারী শরীফের হাদীস। সাধারণ ঐতিহাসিকরা এভাবে বর্ণনা করেন যে, তিনি (সা.) হযরত আলী অথবা কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে সা'দ বিন ওয়াক্কাস (রা.)-কে তাদের পেছনে পেছনে প্রেরণ করেন আর বলেন, তাদের সম্পর্কে খোঁজ নাও, কুরাইশ সেনারা আবার মদীনার ওপর আক্রমণের সংকল্প করছে না তো? তিনি (সা.) তাকে বলেন, কুরাইশরা যদি উটে আরোহিত থাকে আর ঘোড়াগুলোকে এমনিতেই হাঁকিয়ে নিয়ে যায় তাহলে বুঝবে, তারা মক্কার উদ্দেশ্যে ফিরে যাচ্ছে এবং মদীনায় আক্রমণের কোন অভিপ্রায় নেই। কিন্তু তারা যদি ঘোড়ায় আরোহিত থাকে তাহলে বুঝবে তাদের উদ্দেশ্য শুভ নয়। একই সাথে তিনি (সা.) তাদেরকে জোর দিয়ে বলেন, কুরাইশ সেনাদল যদি মদীনার দিকে যায় তাহলে যেন তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে সংবাদ দেওয়া হয়। আর তিনি অত্যন্ত উত্তেজনার সাথে বলেন, কুরাইশরা এখন যদি মদীনায় আক্রমণ করে তাহলে খোদার কসম! আমরা তাদের মোকাবিলা করে তাদেরকে এই আক্রমণের স্বাদ আস্বাদন করাবো। যাহোক, এই প্রতিনিধিদল যে গিয়েছিল তারা অতিদ্রুত এই সংবাদ নিয়ে ফিরে আসে যে, কুরাইশ সেনাদল মক্কা অভিমুখেই যাচ্ছে। স্মৃতিচারণের এই ধারা আগামীতেও চলবে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৪৯৯-৫০০)

১ পাতার শেষাংশ.....

****

নদ-নদীর মাধ্যমে জলের প্রবাহ বিশেষ বিশেষ পথে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পতিত হয়, নদীর ধারাগুলি ভূ-পৃষ্ঠে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে না যাতে তা মানুষের বসবাসের যোগ্য না থাকে। এই বিষয়গুলি থেকে একটি স্পষ্ট উপসংহারে পৌঁছনো যায় যে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিস একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। পৃথিবী বিভিন্ন বস্তসমূহের সমষ্টি নয়, এগুলি ভিন্ন ভিন্ন যেন একই শৃঙ্খলের এক একটি আংটা। একটি আংটা বের করে দিলে সেটি আর শৃঙ্খল থাকে না। অনুরূপভাবে এই ব্রহ্মাণ্ড থেকে একটি বস্তু বের করে দিলে সমস্ত জগত ধ্বংস হয়ে যাবে। সমুদ্রকে শুকিয়ে দিয়ে পানি শেষ হয়ে যাবে আর নদী শুকিয়ে দিলে সমুদ্র শুকিয়ে যাবে। নদীর জন্য গতিপথ তৈরী করে সেই উতরাই সমান করে দিলে সমস্ত জগতের পানি ছড়িয়ে পড়বে আর পৃথিবী বসবাসযোগ্য থাকবে না। পর্বত সরিয়ে দিলে ভূমিকম্প হয়ে মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে। নদ-নদীর জন্য জলরাশি অবশিষ্ট থাকবে না আর সমস্ত পানি একত্রে সমুদ্রে গিয়ে পড়বে। একদিকে পৃথিবীতে বন্যা দেখা দিবে অপরদিকে সারা বছর জলের সহজলভ্যতা বজায় থাকবে না। চাঁদ-সূর্য সরিয়ে দিলে পৃথিবীর সৃষ্টি-শৃঙ্খলার উপর তাদের যে প্রভাব ছিল তা বিলুপ্ত হবে আর পৃথিবীর অবস্থা আগের মত থাকবে না। সূর্যকে পৃথক করে দিলে মেঘের শৃঙ্খলা থাকবে না আর মানুষ পানির জন্য হাহাকার করবে। শাক-সব্জি উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে, মানুষের স্বাস্থ্যভঙ্গ হবে এবং প্রাণীজ খাদ্য তৈরীর প্রক্রিয়ার সম্ভাবনাও থাকবে না। মোটকথা সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড একত্রে মানুষের সেবায় নিয়োজিত, এর প্রতিটি অংশ অপর অংশকে টিকিয়ে রাখার মাধ্যম। এমনটি হলে দুই খোদার মতবাদটি কিভাবে সঠিক হতে পারে? পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা যদি একাধিক খোদা হত ,তবে কোন অংশটি সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে সেটি অন্য থেকে আলাদা আর তাতে বোঝা যেতে পারে যে, সেটি অন্য কেউ সৃষ্টি করেছে? আর যদি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড একটি শৃঙ্খলে সন্নিবিষ্ট থাকে, তবে এর স্রষ্টা হিসেবে একজন খোদাকেই স্বীকার করতে হবে। অন্যথায় একথা বলতে হবে যে, খোদা তা'লার মধ্যে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করার শক্তি ছিল না। এইজন্য একাধিক খোদা মিলে কাজ ভাগ করে নিয়েছে এবং পূর্ব প্রস্তাবিত নকশা অনুযায়ী প্রত্যেকে নিজের নিজের অংশের কাজ পূর্ণ করেছে। কিন্তু মুশরিকরাও এমন মতবাদ পোষণ করে না আর তা বাস্তববুদ্ধির পরিপন্থী। কেননা অসম্পূর্ণ সত্তা খোদা হতে পারে না। অতএব এই প্রমাণের উপস্থিতিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, তিনিই তোমাদের খোদা, যিনি এক ও অদ্বিতীয়।

দেখনদারির উদ্দেশ্যে মোহর ধার্য করা অনুচিত।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

পারস্পরিক সহমতি নিয়ে যেটা হয় তাতে কোন অসুবিধে নেই। আর শরিয়ত সম্মত মোহর বলতে একথা বোঝায় না যে, কুরআন এবং হাদীসে এর কোন সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। বরং এর দ্বারা সেই যুগের মানুষের প্রচলিত মোহরকে বোঝানো হয়েছে। আমাদের দেশের এটাই দোষ, এর পেছনে উদ্দেশ্য অন্য কিছু থাকে আর শুধুমাত্র প্রদর্শনের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা মোহর ধার্য করা হয়। শুধু ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এটা লেখা হয় যাতে পুরুষ নিয়ন্তণে থাকে। এর ফলে অন্যান্য মন্দ পরিণাম প্রকাশ পেতে পারে। (মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৮৪)

(রিশতা-নাতা বিভাগ, নাযারত ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া কাদিয়ান)

কখনই এর জন্য এমন অর্থকে স্বীকার করব না যার ফলে কুরআনের সঙ্গে বিরোধিতা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়।

অতএব উপরোক্ত মাপকাঠিতে যে হাদীস উত্তীর্ণ হবে, সেটি যে কোন পুস্তকের হতে পারে, জামাত আহমদীয়ার নিকট তা গ্রহণযোগ্য এবং যুক্তিসঙ্গত।

প্রশ্ন: এক মহিলা স্বেচ্ছায় নিজের সন্তানকে তার ভাসুর জায়াকে দিয়ে দেয়। বেশ কয়েক বছর পর উভয় পরিবারের মধ্যে মনমালিন্য দেখা দিলে মায়ের পক্ষ থেকে সন্তানকে ফিরিয়ে নেওয়ার দাবি করা হয়। এ সম্পর্কে হুযুর আনোয়ারের কাছে পথনির্দেশনা চাওয়া হলে হুযুর ২০২০ সালের ২৪ শে জুন তারিখের চিঠিতে লেখেন–

সাধারণ পার্থিব বস্তুসমূহের লেনদেনের ক্ষেত্রে মানুষ যখন স্বেচ্ছায় ও সানন্দে কাউকে কোন জিনিস দিয়ে দেয়, তবে তা ফিরিয়ে নিতে চাওয়াকে ভাল চোখে দেখা হয় না। সন্তান যদিও এই ধরণের জাগতিক বস্তু হিসেবে বিবেচিত হয় না, তবুও যখন কেউ স্বেচ্ছায় ও সানন্দে নিজের সন্তানকে কাউকে দিয়ে দেয় আর গ্রহণকারী ব্যক্তি সেই সন্তানকে নিজের মত করে রাখে, তবে তাকে ফিরিয়ে নিতে চাওয়াও নীতিগতভাবে অপছন্দনীয়। এই কারণে জামাতের বিচারবিভাগীয় সমস্ত কাজিরা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে এই সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন যে, প্রকৃত মায়ের তার সেই সন্তানকে ফিরে চাওয়া উচিত নয়।

আমার মতে শিশুর বয়স যদি নয় বছরের বেশি হয়,তবে ভাল-মন্দ বিচার ক্ষমতা সংক্রান্ত ফিকাহশাস্ত্রের নীতি অনুসারে এই বিষয়টির সিদ্ধান্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় আর শিশুকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে সে কার কাছে থাকতে চায়? শিশু স্বেচ্ছায় যেখানে যাওয়ার সম্মতি জানায়, তাকে সেখানেই রাখা হোক।

আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের উভয় পরিবারকে বিবেক-বুদ্ধি দান করুন। আপনারা যেন খোদা-ভীতি ও তাকওয়াকে দৃষ্টিপটে রেখে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একে অপরের জন্য নিজের বৈধ অধিকারগুলি ত্যাগ করে এই সমস্ত বিবাদের মীমাংসাকারী হন। আমীন।

প্রশ্ন: জামেয়া আহমদীয়া ঘানার ছাত্রদের সঙ্গে একটি ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে একজন ছাত্র প্রশ্ন করে যে, যারা খোদা তা'লা বিশ্বাস করে না, তাদেরকে বোঝানোর জন্য সব থেকে দৃঢ় প্রমাণ কোনটি? হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:

যারা খোদা তা'লাকে বিশ্বাস করে না,তারা কথাও শুনতে চায় না। খোদা তা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে মজবুত যুক্তিপ্রমাণ লাভ একপ্রকার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। আপনি তাদেরকে বলুন, তোমরা বল খোদা নেই আমি বলি খোদা আছেন। আমি খোদার কাছে চেয়েছি আর তিনি আমাকে দিয়েছেন।আপনার কোন দোয়া কবুল হয়েছ তো? আপনি কখনও দোয়া করেছেন আর সেই দোয়া আপনার কবুল হয়েছে তো? (ছাত্রটি উত্তর দেয়, আজ্ঞে হুযুর!) যারা খোদাকে বিশ্বাস করে না, তাদেরকে বলুন, তোমরা যে বল খোদা নেই, আমি তো খোদার কাছে চেয়েছি আর তিনি আমাকে দিয়েছেন। খোদা তা'লার উপর তো আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমি কিভাবে বলতে পারি যে খোদা নেই। চেষ্টা করলে তোমরাও খোদাকে পাবে। কিন্তু যারা খোদাকে বিশ্বাস করে না, তারা বড্ড একগুঁয়ো প্রকৃতির হয়ে থাকে। এখানেও একজন নাস্তিক আছে যার নাম রিচার্ড ডকিনস। সেও খোদাকে মানে না; খোদার বিরুদ্ধে সে একটি বইও লিখেছে। আমি তাকে ইসলামী নীতি=দর্শন ও অন্যান্য বই=পুস্তকও পাঠিয়েছি। আমি বলেছি, এই বইগুলি পড়ার পর আমার সঙ্গে কথা বলুন। এগুলি পড়লে জানতে পারবে যে, খোদা কি এবং তাঁর সম্পর্কে ধারণাটি কি? সে বলল, আমি কিছু পড়ব না। তুমি আমার বইটি পড়, তোমার কোন বই আমি পড়ছি না। তাই দেখা গেছে এরা প্রচণ্ড একগুঁয়ো হয়ে থাকে আর এমন একগুঁয়ো হয় যে, তারা কোনওভাবেই মানবে না। কিন্তু যাদের মধ্যে কিছুটা পুণ্য ও সততা রয়েছে, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখুন এবং এই সম্পর্কের মাধ্যমে খোদা তা'লার সঙ্গে তাদের নৈকট্য তৈরী করুন। অনেক সময় খোদার সঙ্গে নিজের নৈকট্যও অন্যকে প্রভাবিত করে এবং অপরের পরিবর্তনের কারণ হয়। তাই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সবথেকে কার্যকরী উপায়।এখানে আমার সঙ্গেও অনেক সময় প্রেসের লোক এবং অন্যান্য লোকেরা সাক্ষাত করতে আসে। অনেকে পরে একথা ব্যক্ত করেছে যে, আমরা খোদায় বিশ্বাসী নয়, কিন্তু যদি কখনও খোদায় বিশ্বাসী হই তবে তোমাদের খলীফার কারণে হব। কেননা তিনি আমাদেরকে খোদা তা'লা সম্পর্কে সঠিক ব্যুৎপত্তি দান করেছেন। এছাড়া হৃদয় কোমল করার জন্য দোয়া করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন মানুষের হৃদয়কে কোমল করেন। এর জন্য নিজের ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা এবং দোয়া কবুলের জন্য নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করাও ভীষণ জরুরী। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আমার নিজের সঙ্গে আল্লাহ্ তা'লা কিরূপ আচরণ করেন? যখন নিজের প্রতি আল্লাহ্র আচরণের কথা তাদেরকে শোনাবেন, তখন তাদের উপর প্রথম অভিজ্ঞতাটি ভাল পড়বে, এর দ্বারা মানুষ বেশি প্রভাবিত হয়। আর দলিলের কথা বলতে গেলে তা অসংখ্য রয়েছে। 'হামারা খোদা'(আমাদের খোদা), 'হস্তিয়ে বারি তা'লা কে দশ দালায়েল' (আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের দশটি প্রমাণ), হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) প্রণীত 'হাস্তিয়ে বারি তা'লা' (আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব) প্রভৃতি পুস্তক রয়েছে। এগুলি উর্দুতেও এবং ইংরেজিতেও প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি পড়ুন এবং তাদেরকেও পড়তে দিন। তাছাড়া শিক্ষিত ব্যক্তিদের 'ইসলামী নীতিদর্শন' প্রথমে দেওয়া উচিত। এরপর তাদেরকে 'হাস্তিয়ে বারি তা'লা কে দশ দালায়েল' বইটি দেওয়া উচিত। বইগুলি ছোট ছোট। এর পর হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) Revealation, Rationality, knowledge and Truth' পুস্তকটি দেওয়া উচিত। এই পুস্তকে খোদা তা'লার অস্তিত্বের বিষয়ে একটি অধ্যায় রয়েছে। এটিও অনেককে প্রভাবিত করে। হামারা খোদা' বইটিও ইংরেজিতে অনুদিত হয়েছে। (বাংলা অনুবাদ– 'আমাদের খোদা'– অনুবাদক) সেটিও পড়ার জন্য দেওয়া উচিত। পড়ার পরও যদি কেউ স্বীকার না করে তবে আমাদের কাজ হল কেবল বাণী পৌঁছে দেওয়া। কারো হিদায়াতের জন্য আমরা নিশ্চয়তা দিতে পারি না। হেদায়াত দেওয়ার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ নিজে গ্রহণ করেছেন। আর আমাদের উপর শুধু তবলীগের এবং আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় নিয়ে আসার দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন।

প্রশ্ন: উক্ত অনুষ্ঠানেই আরও এক ছাত্র প্রশ্ন করে যে, খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জনের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা কোনটি?

হুযুর (আই.) বলেন: আল্লাহ তা'লার ইবাদত কর। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,'আমি মানুষকে কেবল ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। 'ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লি ইয়াবুদুন।' নিজের সৃষ্টির যে স্বার্থকতা তা পূর্ণ করুন। আল্লাহ্ তা'লার প্রথম নির্দেশটি হল অদৃশ্যের উপর ঈমান আনা। অদৃশ্যের উপর ঈমানের পর রয়েছে নামায কায়েম কর। আল্লাহ্ তা'লার আদেশ হল নামায কায়েম কর। অতএব,দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ইবাদত। আল্লাহ তা'লার উপর ঈমান আনার পর নামায কায়েম করতে হবে। এরপর আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, নামাযের মধ্যে সিজদারত অবস্থায় মানুষ আল্লাহ্র সব থেকে নিকটে থাকে। তাই সিজদায় আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া কর যে, আল্লাহ্ তা'লা তুমি আমাদেরকে স্বীয় নৈকট্য দান কর।

গত ১০ অক্টোবর ২০২০ তারিখে মজলিস আতফালুল আহমদীয়া, অস্ট্রেলিয়ার আতফালরা ভার্চুয়াল সাক্ষাতে হুযুর (আই.)-এর কল্যাণময় সান্নিধ্য লাভ করে। তারা বিভিন্ন বিষয়ে হুযুর (আই.)-কে প্রশ্ন করার সুযোগ পেয়েছিল। এই প্রশ্নোত্তর পর্বে ধর্মতত্ত্ব, বিজ্ঞান, ইতিহাস এমনকি হুযুরের ব্যক্তিগত স্মৃতি নিয়েও আলোচনা হয়। বিশেষ বিশেষ প্রশ্নোত্তর পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করছি।

প্রশ্নঃ আল্লাহ্ তা'লা মানবজাতির মধ্য থেকে কীভাবে তাঁর নবী মনোনীত করেন?

উত্তর: দেখ, এই বিষয়ে আল্লাহ্ই ভাল জানেন। পৃথিবীতে অনেক মানুষই পুণ্যবান হয়ে থাকে এবং গোঁড়া থেকেই তারা ধার্মিক। আল্লাহ্ শুরু থেকেই জানেন যে, তারা ভবিষ্যতে নবী হবেন। এজন্য আল্লাহ্ তাদের শৈশব থেকেই প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলেন এবং তাদেরকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ্ তাদের চরিত্রকে এমনভাবে গড়ে তোলেন যে, তারা জীবনে কখনো পাপ কাজ করে না। বুঝেছ?

আমরা যেভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর একটি ঘটনা জানি। তিনি (সা.) যখন ৬-৭ বছরের ছোট শিশু ছিলেন। একদিন তিনি যখন একটি গ্রামে অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে খেলছিলেন; আরবের রীতি অনুযায়ী তাঁর মা ঐ গ্রামে তাকে লালন পালনের জন্য দুধমাতার কাছে প্রেরণ করেছিলেন। লক্ষ্য কর, সেখানে কি ঘটনা ঘটেছিল! সেখানে উপস্থিত অন্যান্য শিশুরা দেখেছিল যে, সেখানে মহানবী (সা.)-এর কাছে এক ব্যক্তি আসে। তখন তিনি শিশু ছিলেন। লোকটি তাঁকে মাটিতে শুইয়ে দিলেন এবং তাঁর বুক চিরে ফেললেন। এরপর তাঁর হৃৎপিণ্ড বের করে আনলেন।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: **Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura**

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

সেই ব্যক্তি মো'মেন যার হৃদয়ে ঐশী ভালবাসা উন্মাদনার ন্যায় বদ্ধমূল হয়েছে। সে সিদ্ধান্ত করেছে যে, যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট ও লাঞ্ছনাতেও খোদার সঙ্গ ত্যাগ করবে না। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩১)

দোয়াপ্রার্থী: **Qazi Abdur Rashid and Family, Basanatapur, 24 pgs(s)**

তারপর এটিকে পরিশুদ্ধ করলেন এবং তাঁর বুকে পুনঃস্থাপন করে দিলেন। এই দৃশ্য দেখে ঐ সকল বাচ্চারা অনেক ভয় পায়। স্বয়ং মহানবী (সা.) অনেক ভীত ছিলেন। ঐ সকল বাচ্চারা সে স্থান থেকে পালিয়ে গিয়েছিল এবং তারা মহানবী (সা.)-এর দুধমাতাকে এই বিষয়টি জানায়। তারপর তিনি দ্রুত বের হয়ে আসেন এবং মহানবী (সা.)-এর দিকে ছুটে যান। তিনি মহানবী (সা.)-এর কি হল তা নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ছিলেন। যখন তিনি দেখলেন যে, তিনি (সা.) নিরাপদে আছেন। তখন বুঝলেন, এটি আসলে একটি দিব্যদর্শন ছিল। তথা মহানবী এবং ঐ সকল বাচ্চারা দেখেছিল যে, একজন ফিরিশতা আসে এবং তিনি মহানবীর (সা.) বুক চিরে তা পরিশুদ্ধ করেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা এভাবেই ঐ ব্যক্তির হৃদয় পরিশুদ্ধ করেন যে-কিনা ভবিষ্যতে নবী হবেন। তিনি তাকে প্রশিক্ষণ দেন, গড়ে তোলেন। এটুকুই আমরা জানি। এছাড়াও অন্যান্য অনেক কিছু আছে যা আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর নবীগণই ভাল জানেন।

প্রশ্ন: প্রিয় হুযূর, আমি অনেকের কাছ থেকে শুনেছি যে, এই বিশ্ব ৭ দিনে তৈরি হয়েছিল। যদি সূর্য ৪র্থ দিনে তৈরি হয়ে থাকে তাহলে তার আগে (সূর্য তৈরি হওয়ার আগের) দিনগুলো কীভাবে কেটেছে বা সেদিনগুলো কেমন ছিল?

উত্তর: দেখ! এ সবগুলো রূপক বর্ণনা। এক জায়গায় আল্লাহ্ বলেছেন, আমার ১ দিন তোমাদের ১ হাজার বছরের সমান। অন্য জায়গায় বলেছেন, আমার একদিন তোমাদের ৫০ হাজার বছরের সমান। যেখানে আল্লাহ্ তা'লার ১ দিন ৫০ হাজার বছরের সমান। একদিনে যদি ৫০ হাজার বছর পার হয়ে যায় তাহলে ২ লাখ বছর সূর্য ছাড়া পৃথিবীর কী অবস্থা হয়ে থাকবে! এভাবে চিন্তা করতে হবে। অতএব এগুলো আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা ঠিক না। কেননা, এগুলো রূপক বিষয়। আল্লাহ্ তা'লা ধাপে ধাপে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। প্রথম ধাপ, দ্বিতীয় ধাপ, তৃতীয় ধাপ, চতুর্থ ধাপ, পঞ্চম ধাপ, ষষ্ঠ ধাপ এরপর সপ্তম দিন আল্লাহ্ তা'লা বিশ্রাম করলেন, বসে থাকলেন দেখার জন্য যে, তোমরা ঠিকমত কাজ করো কি-না। আত্মা এক নিমেষেই সৃষ্টি হয় নি। বিশ্ব জগতের সৃষ্টি তো কয়েক কোটি বছর পূর্বে হয়েছে। বিজ্ঞানীদের ভাষ্যমতে ২০ বিলিয়ন বছর পূর্বে এ বিশ্ব জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। পবিত্র কুরআন দ্বারাও এ বিষয়টি সাব্যস্ত যে, এ বিশ্বজগত ১৮.৫ বা ১৯ বিলিয়ন বছর পূর্বে সৃষ্টি হয়েছে। এর পূর্বে অন্যান্য নক্ষত্রও ছিল। বিগ-ব্যাঙ সংগঠিত হওয়ার পর এই মহাজগৎ সৃষ্টি হয়েছে- তাই না? আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এর পূর্বে আরো অনেকগুলো বিগ-ব্যাঙ সংঘটিত হয়েছে। আমরা কেবলমাত্র আমাদের এই পরিচিত পৃথিবী সম্পর্কেই জানি। তোমরা তো অস্ট্রেলিয়াতে বসবাস করছো। সেখানে আদিবাসীরা বসবাস করছে। এই আদিবাসী লোকেরা যারা জঙ্গলে বসবাস করে। তারা বলে যে, আমরা ৪৫ হাজার বছর আগের আদিবাসী। আর আমাদের ধর্মও ৪৫ হাজার বছরের পুরনো। আমরা যারা মুসলমান, খ্রিস্টান বা ইহুদী, আমাদের ইতিহাস কেবল ৬ হাজার বছরের পুরনো। অতএব অস্ট্রেলিয়ার যারা আদিবাসী, এরা তো বহু পুরনো মানুষ। প্রত্যেক বিষয়কে আমরা সহজ অঙ্ক কসে নির্ণয় করতে পারব- এমনটি সম্ভব নয়। যখন পৃথিবী সৃষ্টি হয়, আল্লাহ্ বলেন, এটি প্রথমে অগ্নিপিণ্ড ছিল। এরপর আল্লাহ্ তা'লা এর মাঝে পানি সৃষ্টি করলেন। বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন, মেঘমালা এসেছে, বৃষ্টি হয়েছে আবার পানি বাষ্পে পরিণত হয়েছে, আবার বৃষ্টি হয়েছে। এভাবে পৃথিবীর উপরিভাগ ঠাণ্ডা হয়ে বসবাসের উপযোগী হয়েছে। আমাদের পৃথিবীর শতকরা ৭৫ ভাগ পানি আর ভূমির পরিমাণ মাত্র শতকরা ২৫ ভাগ। ভূগর্ভে এখনো তরল লাভা রয়েছে। উপরিভাগে যে আগ্নেয়গিরি থেকে লাভা নির্গত হয়, তাছাড়া যখন ভূমিকম্প হয় তখন এগুলো ভূগর্ভ থেকে বের হয়। ভেতর থেকে গরম আগুন যা এখন বের হয়, পূর্বে বহিরাংশেও এমনটিই ছিল। এরপরে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হওয়ার পর এতে প্রাণের উন্মেষ ঘটেছে। জনবসতি শুরু হয়ে মানব সভ্যতার সূচনা হয়েছে এবং তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইতিপূর্বে এসব কিছুই ছিল না। তখন সূর্য থাকুক বা না থাকুক তাতে আমাদের কি যায় আসে? আল্লাহ্ যখন ভাবলেন, পৃথিবীতে প্রাণের উন্মেষ ঘটাবেন, পৃথিবীকে মানুষ বসবাসের উপযোগী করবেন, তখন চাঁদ-সূর্য ইত্যাদি আমাদের উপকারার্থে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এর পূর্বে কি ছিল আর কি ছিল না- সে সম্পর্কে আমরা কি-বা জানি!

প্রশ্নঃ আমার নাম সৈয়দ মুস্তফা শাহ্। আমার প্রশ্ন হল, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ (রাবে.)-এর মৃত্যুর সংবাদে আপনার কেমন অনুভূতি হয়েছিল?

উত্তর: দেখ! তাঁর মৃত্যুর একদিন পূর্বে আমি তাঁর খুতবা শুনেছিলাম, তাঁকে খুব সুস্থ সতেজ লাগছিল। সন্ধ্যার সময় তিনি মসজিদে সাক্ষাত করেন এবং সেসময়ও তাকে খুব সতেজ লাগছিল। পরবর্তী দিন যখন শুনলাম তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। তখন আমি খুবই মর্মাহত ছিলাম। আমি যখন অফিস থেকে বাসায় ফিরলাম তখন আমি এই দুঃখজনক খবর পেয়েছিলাম। আমার অনুভূতি ঠিক সেরকম ছিল যেমন তোমার প্রিয় মানুষ মারা গেলে তোমার অনুভূতি হবে। তখন যেমন তুমি কষ্ট অনুভব করবে ঠিক তেমনই আমি অনুভব করেছিলাম।

প্রশ্নঃ প্রিয় হুযূর, আমার নাম মুহাম্মদ ফিযান। আমার প্রশ্ন হল, এই কোভিড মহামারীর মধ্যে বাসায় বাজামা'ত নামায আদায় করলে কি মসজিদে নামায আদায় করার মত একই পুণ্য বা পুরস্কার পাওয়া যাবে?

উত্তর: দেখ, তুমি এটা ইচ্ছাকৃতভাবে করছ না। আমরা এটা করতে বাধ্য হচ্ছি। আর আল্লাহ্ সবার কর্মকাণ্ড এবং নিয়্যত সম্পর্কে সর্বজ্ঞাত। আমরা যদি নিজে থেকে মসজিদে না যাই আর বিনা কারণে মসজিদে বাজামা'ত নামায আদায় করা হতে বিরত থাকি তাহলে সেটা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে পাপ বলে গণ্য হবে। কিন্তু যখন বিভিন্ন ধরনের বাধা বিপত্তি থাকবে এবং তোমার কাছে আর কোন উপায় থাকবে না। তখন তুমি শত বাধা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ মেনে চলার জন্য বাসায় নিজ ভাইবোন এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে বাজামা'ত নামায আদায় করছ। তখন আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবার নিয়্যত অনুযায়ী তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। এ কারণেই মহানবী (সা.) বলেছেন, "ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়্যাত।" অর্থাৎ তোমার কর্মের ফল তোমার নিয়্যতের ওপর নির্ভর করে ও লাভ হবে। তুমি যদি ভাল নিয়্যতে কোন কাজ কর, তাহলে আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম পুরস্কার প্রদান করবেন। আল্লাহ্ তা'লা খুবই করুণাময়। তুমি যদি কোন ভাল কাজ খারাপ উদ্দেশ্যে কর তাহলে তা পাপ। এমনকি দান খয়রাতও যদি খারাপ উদ্দেশ্যে করা হয় তাহলে তা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে মন্দকাজ। অতএব, যেকোন কিছু ভাল নিয়্যত নিয়ে করলে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সে ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করবেন।

গত ৩১ অক্টোবর ২০২০ জামেয়া আহমদীয়াইন্দোনেশিয়ার একশ'র অধিক ছাত্রদের সাথে হুযূর (আই.)-এর ভার্চুয়াল ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। এই ক্লাসে ছাত্ররা হুযূরকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করার সুযোগ লাভ করেছিল। কয়েকটি প্রশ্নোত্তর উপস্থাপন করা হল।

প্রশ্ন: আমার প্রশ্ন হলো, এ যুগে অনেক লোক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। আমরা তাদেরকে কী উত্তর দিতে পারি?

প্রিয় হুযূর: প্রথম কথা হল, আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-কে স্বয়ং বলেছেন, "ইন্নি মুহিনুন মান আরাদা ইহানাতাকা" অর্থাৎ যারা তোমাকে লাঞ্ছিত করতে চায়, আমি স্বয়ং তাদেরকে লাঞ্ছিত করব। অর্থাৎ আমি তাদেরকে ইহকালে এবং পরকালে লাঞ্ছিত করব। এমনকি তাদের সন্তানরাও লাঞ্ছিত হবে। যারা সজ্ঞানে এই দুঃসাহস দেখায়, তাদের বিষয়ে আল্লাহ্ নিজেই মীমাংসা করবেন। কিন্তু আমাদের উত্তর সেটিই হওয়া উচিত যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন। তিনি (আ.) বলেন, "তোমরা ধৈর্য ধারণ করো আর কোন ব্যক্তির রূঢ় কথার দরুণ শক্ত ভাষা ব্যবহার করো না। তোমরা বিবাদে জড়াবে না। জানি তোমরা আমাকে অনেক ভালবাসো। তবুও তোমরা বিবাদে জড়াবে না। ভেবে দেখো! আমরা তো এ যুগে মহানবী (সা.)-কে সবচেয়ে বেশি ভালবাসি। আমরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর চেয়ে বেশি ভালবাসি। কিন্তু বর্তমানে ফ্রান্সে আর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মহানবী (সা.)-এর কার্টুন বানিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়। এর প্রতিক্রিয়া আমরা কীভাবে ব্যক্ত করছি? আমরা বলছি, সবাই মহানবী (সা.)-এর প্রতি অধিকহারে দরূদ প্রেরণ করুন। আর আমরা যখন মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করি, তখন মুহাম্মদের (সা.)-এর বংশধরদের প্রতিও দরূদ প্রেরণ করে থাকি। মুহাম্মদ (সা.)-এর উত্তরসূরীরাও এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আর মহানবী (সা.)-এর সবচেয়ে বড় উত্তরসূরী হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)। তিনি (আ.)-ই তাঁর (সা.) বংশধরের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হবার সর্বাধিক যোগ্য। তাই আমাদের কাজ হল, মানুষ যখন ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে, তখন আমরা প্রথমে দরূদ পাঠ করবো, তা মহানবী (সা.)-কে নিয়েই ঠাট্টা-

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Badruddin, Neogir hat, (South 24 PGS)

আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং কুরআন মজীদের রক্ষক

-মৌলানা মহম্মদ হামীদ কওসার, নাযির দাওয়াতে ইলাল্লাহ্, দক্ষিণ ভারত

আবেদনকারীর পক্ষ থেকে উপস্থাপিত আয়াতের আরবী ও ব্যাখ্যাসহ অনুবাদ নিম্নরূপ।

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অর্থ: এবং যখন নিষিদ্ধ মাসসমূহ অতিক্রান্ত হইবে তখন তোমরা মোশরেকদের (এই বিশেষ দলকে) যেখানে পাও হত্যা কর, তাহাদিগকে গ্রেফতার কর, তাহাদিগকে অবরুদ্ধ কর, এবং তাহাদের জন্য প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওঁৎ পাতিয়া থাক। কিন্তু যদি তাহারা তওবা করে এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয় তাহা হইলে তাহাদের পথ ছাড়িয়া দাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

(সূরা তওবা: ৫)

আবেদনকারীর পক্ষ থেকে যে আয়াত গুলি উপস্থাপন করে কুরআন করীম এবং ইসলামের প্রতি জঘন্য অপবাদ আরোপ করেছে তা থেকে প্রমাণ হয় যে এই ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সেই সমস্ত কারণগুলিকে এড়িয়ে গিয়েছে যেগুলি এই আয়াতসমূহের নাযেল হওয়ার কারণ হয়েছিল। উক্ত আয়াতের সম্পর্ক সৈয়্যদানা হযরত মহম্মদ (সা.) এবং মুসলমানদের সেই যুগের সম্পর্কে যখন তারা মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধকে প্রতিহত করতে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল। আবেদনকারী এবং তার সমচিন্তকরা একটু ভেবে দেখুক যে পবিত্র মক্কা শহরের এক ব্যক্তি নিজের ঘরবাড়ি, সহায়-সম্পদ ও ব্যবসা বাণিজ্য বাধ্য হয়ে ত্যাগ করে আড়াই শো মাইল দূরে মদীনায় নতুন জীবন শুরু করতে হিজরত করে। আর এই শত্রুরা অস্ত্র হাতে নিয়ে মদীনা পোঁছে তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে ফেলতে চায়। কোন সৎ বিবেকবান মানুষ একথা বলুক যে, এমন পরিস্থিতিতে সেই অত্যাচারিত ব্যক্তির নিজের অস্তিত্ব ও ধর্মকে রক্ষা করার অধিকার আছে কি না? জগতের প্রত্যেক সভ্য এবং ন্যায়পরায়ণ মানুষ এই প্রশ্নের উত্তরে এই অবস্থানই গ্রহণ করবে যে, এখানে সেই অত্যাচারিতদের নিজেদের আত্মরক্ষা করার পূর্ণ অধিকার ছিল। কিন্তু ইসলামের শত্রুরা বিগত চৌদ্দশ বছর থেকে এই অধিকার নিয়েই আপত্তি করে আসছে।

এই আয়াতগুলি আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হল।

ব্যাখ্যা: আবেদনকারী তার আবেদনে যে আয়াতগুলি লিপিবদ্ধ করেছে তার ব্যাখ্যা উপস্থাপনের পূর্বে এই আয়াত এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য কয়েকটি আয়াতের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা সমীচীন হবে।

আনুমানিক ৬১০ সালের ২০ শে আগস্ট আঁ হযরত (সা.)-এর উপর কুরআন করীম অবতীর্ণ হওয়া আরম্ভ হয়। এরই সাথে তিনি মক্কাবাসীদেরকে ইসলাম গ্রহণের প্রতি আহ্বান করেন। তাদেরকে শিরক ও জুলুম-অত্যাচার এবং পাপময় অপবিত্র জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার দিকে আহ্বান করেন এবং তাদেরকে পবিত্র জীবন যাপনের প্রতি আহ্বান করেন। এতে হুযুর (সা.)-এ নিজেরর কোনও লাভ ছিল না। বরং মক্কাবাসীদের উন্নতি ও সমৃদ্ধিই ছিল তাঁর লক্ষ্য। মক্কাবাসীদের মধ্যে থেকে যারা এর উপকার উপলব্ধি করতে পারত তারা ইসলাম গ্রহণ করত আর অপরদিকে মক্কার কুরায়েশদের অধিকাংশ হুযুর (সা.) এবং তাঁর উপর ঈমান আনয়নকারীদের উপর অত্যাচার করতে শুরু করে। তারা তাদেরকে কষ্ট দিয়ে আনন্দিত হত। প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্য থেকে হযরত বিলাল বিন রাবা ছিলেন অন্যতম। গ্রীষ্মের দুপুরের প্রচণ্ড দাবদাহে মক্কার পাথুরে জমিগুলি জ্বলন্ত উনুনের ন্যায় উত্তপ্ত হয়ে উঠত আর সেই জমিতে তাঁকে উলঙ্গ করে শুইয়ে দিয়ে বুকের উপর পাথরের বড় বড় চাঁই চাপিয়ে দেওয়া হত আর ইসলাম ত্যাগ করার জন্য তার উপর চাপ সৃষ্টি করা হত। কিন্তু তাঁর মুখ দিয়ে কেবল 'আহাদ', 'আহাদ' শব্দই বের হত। সেই কষ্ট ও যন্ত্রণাকে তিনি পরম উদ্যম সহকারে সহন করে নিতেন। তাঁর মতই আরও কিছু ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিল। যেমন- আবু ফাকিয়া, আমির বিন ফুহাইরাহ ও প্রমুখ। তাদেরকেও অশেষ যন্ত্রণা দেওয়া হয়েছে। তারা সকলে সেই দুঃখ যন্ত্রণা বীরত্বের সঙ্গে সহ্য করেছে। ইসলামী শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মক্কার মহিলারাও ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। তাদের মধ্যে লাবিনা, যুনাইরা, সীমা মক্কার কাফেরা এত বেশি অত্যাচার করত যে, মক্কার আশপাশের পাহাড়গুলিও হয়ত তাদের করুণ আর্তনাদে বিচলিত হয়েছে। যদি তাদের বাকশক্তি থাকত, তবে হয়তো তারা বলে উঠত যে, হে অত্যাচারীরা! ক্ষান্ত হও। অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে।' কাফেরদের পক্ষ থেকে হওয়া জুলুম ও অত্যাচার সহ্য করতে করতে এভাবেই যখন ১৩টি বছর অতিক্রান্ত হল এবং আঁ হযরত (সা.)কে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হল, তখন আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে মক্কা থেকে আড়াইশ মাইল দূরে অবস্থিত মদিনার দিকে হিজরত করে যাওয়ার আদেশ দিলেন।তিনি চাইলে মক্কাবাসীর এই অত্যাচারকে পেশিবলে প্রতিহত করতে পারতেন। এর প্রমাণ হল হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ=এর সেই বর্ণনা যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। যখন হুযুর (সা.) এবং তাঁর অত্যাচারিত সাহাবারা মদিনায় পোঁছে গেলেন, তখন মক্কার কাফের উচিত ছিল তারা নিজেরাও শান্তিতে থাকুক আর মুসলমানদেরকেও শান্তিতে থাকতে দিক। কিন্তু পরিতাপ! এমনটি হয় নি। তার ধারালো অস্ত্র নিয়ে মুসলমানদের মুণ্ডপাত করতে মদিনার দিকে রওনা হল। এক হাজার সৈন্যর মোকাবেলা হয় ৩১৩ জন নিরস্ত্র মুসলমানের সঙ্গে যারা নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে এক-দেড় বছর পূবে মদিনা এসে থিতু হয়েছিলেন। তাঁরা তখনও স্বাবলম্বী হয়ে ওঠেনি, এমনকি তাদের থাকার আশ্রয়টুকুও ছিল না। এমতাবস্থায় মক্কার অত্যাচারিরা তাদের বদরের ময়দানে এসে উপস্থিত হল। মুসলমানেরা কিছু তরবারি, লাঠি-সোঁটা দিয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে অপরদিকে আল্লাহ্ তা'লা তাদের অলৌকিকভাবে সাহায্য ও সমর্থন করেন আর আঁ হযরত (সা.) এবং তার সাহাবাদেরকে যুদ্ধে স্পষ্ট ও মহান বিজয় দান করেন। এই যুদ্ধ থেকেও মক্কার কাফেরা শিক্ষা নেয় নি, তারা প্রতিশোধ নিতে মুসলমানদের উপর একের পর এক আক্রমণ করতে থেকেছে। আঁ হযরত (সা.) তাঁর প্রতিনিধি প্রেরণ করে মক্কার কাফেরদেরকে শান্তি ও যুদ্ধবিরতির উপদেশ দেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় ৬২৮ খৃষ্টাব্দে সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়। কিন্তু এই সন্ধিও বেশি দিন টিকল না, মক্কার কাফেররা চুক্তির যাবতীয় শর্ত উল্লঙ্ঘন করল। চুক্তি ভঙ্গ হলে আঁ হযরত (সা.) সৈন্যবাহিনী নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে মক্কায় প্রবেশ করেন আর এই ঘটনাটি ইতিহাসে মক্কা বিজয় নামে অভিহিত হয়েছে। যে অত্যাচারীরা মক্কায় অনবরত তেরো বছর মুসলমানদের উপর জুলুম করতে থেকেছে, তাদেরকে তিনি প্রশ্ন করলেন- 'হে কুরায়েশের দল! তোমরা কি জান আজ তোমাদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করা হবে?' তারা উত্তর দিল, 'আপনার থেকে আমরা কল্যাণ ছাড়া আর কিসের আশা করতে পারি? মূর্তিমান করুণা হযরত মহম্মদ (সা.) উত্তর দিলেন- আজ আমি তোমাদেরকে সেই কথাটিই বলব য হযরত ইউসুফ তাঁর ভাইদের বলেছিল- আজ তোমরা স্বাধীন, তোমাদের প্রতি কোন অভিযোগ নেই।'

(ইবনে হিশাম)

আঁ হযরত (সা.)-এর এই অতুলনীয় ক্ষমাদানের পরও মুষ্টিমেয় কাফের ও ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদের ক্ষতি করতে থেকেছে এবং খুনোখুনির ধারা অব্যাহত রেখেছে। আর পরিস্থিতি যখন ভয়াবহ রূপ ধারণ করল,তখন আল্লাহ তা'লা আদেশ করলেন-

২ নং আয়াতের আপত্তি। ক)

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অর্থ: এবং যখন নিষিদ্ধ মাসসমূহ অতিক্রান্ত হইবে তখন তোমরা মোশরেকদের (এই বিশেষ দলকে) যেখানে পাও হত্যা কর, তাহাদিগকে গ্রেফতার কর, তাহাদিগকে অবরুদ্ধ কর, এবং তাহাদের জন্য প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওঁৎ পাতিয়া থাক। কিন্তু যদি তাহারা তওবা করে এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয় তাহা হইলে তাহাদের পথ ছাড়িয়া দাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

(সূরা তওবা: ৫)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ۚ وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖٓ اِنْ شَاۗءَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

অর্থ: হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! নিশ্চয় মোশরেকরা অপবিত্র, অতএব তাহারা যেন তাহাদের এই বৎসরের পর মসজিদে হারামের নিকট না আসে। এবং যদি তোমরা দারিদ্রের ভয় কর তাহা হইলে আল্লাহ্ চাহিলে অচিরেই স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা তোমাদিগকে ধনী করিয়া দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী,পরম প্রজ্ঞাময়।

(সূরা তওবা, আয়াত: ২৮)

এই আয়াতটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) বর্ণনা করেন- 'মুশরিকদের অপবিত্র হওয়া বলতে তাদের ধর্মবিশ্বাসের অপবিত্রতাকে বোঝানো হয়েছে। বাহ্যিক বা দৈহিক অপবিত্রতাকে বোঝানো হয় নি। অতএব, মুশরিকদের হজ্জ থেকে বিরত রাখার অর্থ হল তাদেরকে শিরকপূর্ণ প্রথায় হজ্জ করতে বিরত রাখা। কেননা অজ্ঞতার যুগে তারা অনেক সময় বিবস্ত্র হয়ে সঙ্গে প্রতিমা নিয়ে হজ্জ করত। হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং অন্যান্য হানাফী ফিকাহবিদদের নিকটও মুসলমানদের প্রত্যেক মসজিদে এমনকি মসজিদে হারামেও মুশরিকরদের প্রবেশাধিকার রয়েছে। তবে সেখানে নিজেদের শিরকপূর্ণ প্রথা দিয়ে তাদের হজ্জ বা উমরা করার অনুমতি নেই।

(ক্রমশ.....)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol-7 Thursday, 24Feb, 2022 Issue No. 8

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

বিদ্রুপ হোক, অথবা তাঁর দাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপই হোক। আমাদের উচিত, দরূদ পাঠ করা। দ্বিতীয় বিষয় হল, নিজেরা এমন আদর্শ স্থাপন করুন, যেন ঠাট্টা-বিদ্রুপকারীরা এমনিতে চুপ হয়ে যায়। তারা যেন দেখে যে, আমরা হাসি-তামাশা করি অথচ এরা তো ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা আমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছে। এরা তো ভালবাসা এবং সৌহার্দ্যের ফেরিওয়ালা, আমরা তাদের সাথে বিদ্বেষপূর্ণ কথা বলি, এরা আমাদের সাথে ভালবাসার কথা বলে। পবিত্র কুরআনেও এ কথাই লেখা আছে, "কাআন্নাহু ওয়ালিউন হামিম" অর্থাৎ তোমরা যদি তাদের সাথে উত্তম আচরণ করো, তাহলে তারা তোমাদের জন্য জীবন উৎসর্গকারী বন্ধুতে পরিণত হবে। তাই আমাদের প্রতিক্রিয়া হল, আমরা নীরবে নিজেদের আমল সংশোধন করব, নিজেদের আধ্যাত্মিক অবস্থা উন্নত করব, আল্লাহ্‌র সমীপে বিনত হব, দোয়া করব যে, হে আল্লাহ্! এদের সংশোধন করে দাও। আর তোমার দৃষ্টিতে যদি তারা সংশোধনের অযোগ্য হয়েই থাকে, তাহলে হে আল্লাহ্! তুমি তাদের থেকে আমাদের মুক্তি দাও আর তাদেরকে নিশ্চুপ করে দাও। যেন তারা আমাদের প্রিয়জনদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে না পারে তথা মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এবং তার মনিব মহানবী (সা.)-এর অসম্মান করতে না পারে। আর আমরা যেন আনন্দিত হতে পারি।

এ জগতে যখন মহানবী (সা.)-এর সম্মান সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আমরা উৎফুল্ল হই। আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যিনি মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাস। তাঁর সম্মান যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন আমরা আনন্দিত হই। তাই আমাদের দোয়া করা উচিত, আমরা যেন তাঁদের সম্মান সুপ্রতিষ্ঠিত হতে দেখতে পারি, যেন আমরা এর মাধ্যমে আনন্দ লাভ করতে পারি। একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই আমাদের চাইতে হবে। আমরা না লাঠি ধরব, না রাইফেল হাতে নিব আর না-ই আমরা কামান ধরব আর না ছুরি হাতে নিব। আমরা এসব কাজ করব না। আমাদের কাজ আল্লাহ্‌র সমীপে বিনত হওয়া, নিজেদের অবস্থা সংশোধন করা, আর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করা।

প্রশ্ন: অধমের প্রশ্ন হল, আমরা ইনশাআল্লাহ্ কিছুদিন পর কর্মক্ষেত্রে যোগদান করব। সেখানে আমাদের সর্বপ্রথম কী কাজ করা উচিত?

হুযূর: সেখানে গিয়ে প্রথমে দোয়া করতে থাকবেন যে, হে আল্লাহ্! এই জায়গা, যেখানে আমার পদায়ন হয়েছে, আমাকে সঠিকভাবে, ঈমান, বিশ্বস্ততা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার সৌভাগ্য দাও। আর বিশেষত আল্লাহ্‌র সাথে আপনাদের সম্পর্ক দৃঢ় করুন। সর্বদা স্মরণ রাখবেন, দোয়ার কল্যাণে আমাদের সব কাজ হয়। তাই প্রত্যেক মুরব্বী এবং মোবাল্লেগ যখন কার্যক্ষেত্রে যায়, তখন তার এই অঙ্গীকার করা উচিত যে, আজকের পর থেকে আমি কখনো তাহাজ্জুদ নামায পরিত্যাগ করব না। নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায় করব। আপনাদের অনেক মোবাল্লেগ মারা যায়, আমি তাদের স্মৃতিচারণ যখন করি, তখন আমি বলি যে, তারা নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। প্রত্যেক মুরব্বীর প্রতিদিন কমপক্ষে এক ঘণ্টা তাহাজ্জুদ পড়া আবশ্যক। আর তাহাজ্জুদ নামাযে দোয়া করবেন, আল্লাহ্ যেন আপনার কাজে বরকত দেন। এরপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায যেখানে আপনাদের কেন্দ্র আছে, অথবা মসজিদ আছে, যদি আপনারা সেখানে উপস্থিত থাকেন, তাহলে মসজিদে যাবেন আর পাঁচ ওয়াক্তের নামায মসজিদে বাজামা'ত আদায়ের ব্যবস্থা করবেন। আর প্রত্যেক আহমদী যেন তাদের মোবাল্লেগের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক সৃষ্টি করে। যদি আহমদীদের মাঝে পারস্পরিক কোন ধরনের বিভেদ-বিবাদ থেকে থাকে, ক্ষোভ থেকে থাকে তাহলে পারস্পরিক ক্ষোভ দূর করা আপনাদের কাজ। লোকদেরকে বোঝান যে, আমরা সবাই মুমিন আর মুমিন ভাই-ভাই হয়ে থাকে। সেখানে সকল আহমদীকে আপোষ মিমাংসার মাধ্যমে মিলেমিশে থাকার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করাবেন। আর কোন ধরনের ক্ষোভ যদি থেকে থাকে, তবে তা দূর করে দিন। প্রত্যেকের সাথে যেন ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকে আর লোকেরাও যেন আপনাদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাখে, আপনাদেরকে যেন ভালবাসে, আপনারাও যেন তাদেরকে ভালবাসেন। এভাবে আপনারা যখন তাদেরকে কোন কথা বলবেন। তখন তারা আপনাদের কথামত কাজ করবে। একইভাবে যুগ-খলীফার সাথে নিয়মিত সম্পর্ক বজায় রাখবেন। আপনি যে মাসিক রিপোর্ট প্রেরণ করেন, তাছাড়াও প্রতি মাসে আমাকে একটি পত্র লেখার চেষ্টা করুন। যেন বোঝা যায় যে, মুরব্বী সাহেব কেমন কাজ করছেন। আর লোকদের মাঝে এই অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করুন, তারা যেন যুগ-খলীফার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে। আর যখন থেকে এখানে ইন্দোনেশিয়ান ডেস্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, লোকেরা আমার কাছে অনেক পত্র লেখে। অনুবাদ হয়ে আমার কাছে আসে। তাই লোকদের উৎসাহিত করুন, তারা যেন যুগ-খলীফার সাথে যোগাযোগ রাখে। আর নিয়মিত জুমুআর খুতবা শুনবেন, আর এর মাঝে যে নির্দেশাবলী থাকে, আমল করার আদেশ থাকে, তদনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করবেন। প্রথমে মুরব্বী সাহেব স্বয়ং আমল করবেন এরপর অন্যদের তাগিদ করবেন।

প্রশ্ন: অধমের প্রশ্ন হল, ২০২৫ সালে ইন্দোনেশিয়া জামা'তের শতবর্ষ পূর্ণ হবে। খোদা তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনস্বরূপ আমাদের কী কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত?

প্রিয় হুযূর: শতবর্ষ পূর্ণ হবার ক্ষেত্রে আপনারা লক্ষ্য নির্ধারণ করুন যে, আগামী পাঁচ বছরের মাঝে আপনারা অন্ততপক্ষে ১ লক্ষ বয়াত করাবেন। আর প্রত্যেক আহমদীকে আপনারা বাজামা'ত নামাযী বানাবেন। প্রত্যেক আহমদীকে নিয়মিত কুরআন পাঠকারী বানাবেন। প্রত্যেক আহমদীকে খলীফার সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টিকারী বানাবেন। প্রত্যেক আহমদীকে মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণকারী বানাবেন। এগুলো বাস্তবায়ন করতে পারলে এক বিরাট সাফল্য অর্জিত হবে।..

প্রশ্ন: স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার পর প্রত্যাবর্তন করতে ইচ্ছুক এক ব্যক্তির বিষয়ে জানতে চেয়ে নাযিম দারুল ইফতা চিঠি লিখেছেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) উত্তরে লেখেন-

তালাককে এরা খেলার বস্তু বানিয়ে ফেলেছে, তুচ্ছ তুচ্ছ কথা নিয়ে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বসে। একটি একটি ইসলামি আদেশ যার সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ । অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে নিকৃষ্টতম বৈধ বিষয় হল তালাক।

এটা ক্রোধের কোন বিষয় নয়, বরং সম্পূর্ণ অজ্ঞতা। আল্লাহ্ তা'লার দেওয়া অব্যহতি নিয়ে তামাশা করা। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে স্ত্রীদেরকে উৎপীড়ন করার জন্য তালাক সর্বোত্তম কৌশল আর তা যথেচ্ছভাবে এবং নির্বিচারে ব্যবহার করা যেতে পারে।

এমন লোকদের সংশোধন ও শায়েস্তা করতে হযরত উমর (রা.) একত্রে তিন তালাক দেওয়াকে তিন তালাক হিসেবেই গণ্য করেছিলেন। তাই আমার নিকট তালাক হয়ে গেছে এখন আর প্রত্যাবর্তন হতে পারে না। কিন্তু তবুও বিষয়টি আরও খতিয়ে দেখুন।

প্রশ্ন: সদকার টাকা মসজিদ নির্মাণে ব্যয় করা এবং জামাতের বিরুদ্ধে অপলাপকারীদের মৃত্যুতে তাকে দেখতে যাওয়ার বিষয়ে একজন মুরুব্বী সাহেব জানতে চাইলে হুযুর আনোয়ার ১লা জুলাই ২০২০ তারিখের চিঠিতে লেখেন-

মসজিদ ফাণ্ডের জন্য সদকার অর্থের বিষয়ে আপনার মতামত সঠিক। সদকার অর্থ দিয়ে মসজিদ নির্মাণ হয় না। মসজিদের জন্য আলাদা করে হাদিয়া দেওয়া উচিত। জামাতের জন্যও যেখানেই প্রয়োজন হয়, মসজিদ নির্মাণের জন্য আলাদা করে তহবিল গঠন করা হয়।

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হল, যে ব্যক্তি জামাতের বিরুদ্ধে অপলাপকারী ছিল, তার মৃত্যুতে তাকে দেখতে যাওয়ার দরকার কি? যদি এমন ব্যক্তি হত যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর উপর ঈমান আনার তৌফিক পায় নি, কিন্তু সে জীবনে কখনও জামাতের বিরোধিতা করে নি, তবে এমন ব্যক্তির মৃত্যুতে তার আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে শোকপালন করতে বাধা নেই। (ক্রমশ.....)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Badruddin, Neogir hat, (South 24 PGS)

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০ পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir